গৌতমের
পত
শ্রীনরেন্দ্র দেব
শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স
২১ নন্দকুমার চৌধুরী লেন
কলিকাতা

কল্যাণীয়া

শ্রীমতী রমা দেবের করকমলে

খুকী ভাই!

যিনি আজ পৃথিবীর সব চেয়ে বড়ো কবি, তুমি আমাকে তাঁর গান শোনাও, তাই আমি তোমাকে আজ দু'হাজার বছর আগে যিনি পৃথিবীর সব চেয়ে বড়ো 'শাস্তা' ছিলেন তাঁরই গল্প শোনাতে এলুম। একখানি বইয়ে তাঁর গতজন্মের অনেক গল্প আছে। সে বইখানির নাম 'জাতক'। জাতকের কতকগুলি কাহিনী বেছে নিয়ে তোমায় বলছি; যদি ভালো লাগে এবং আরও শুনতে চাও রাজকুমারী, তাহ'লে আবার গুটিকয়েক শোনাবো, বুঝ্‌লে? ইতি

৩, মুক্তারাম রো,
কলিকাতা
১লা আশ্বিন, ১৩৩৭

তোমার—
মোহন দা'

গৌতমবুদ্ধ

শাক্য বুদ্ধদেবের অপর একটি নাম—'গৌতম'।

গৌতমের আরও অনেক নাম ছিল, যেমন—সিদ্ধার্থ, শাক্যমুনি, শাক্যসিংহ, শাক্যদেব ইত্যাদি। তিনি শাক্যবংশে জন্মেছিলেন বলেই তাঁকে অনেকে 'শাক্য' নাম দিয়েছিলো।

কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র তিনি। তাঁর মায়ের নাম ছিল রাণী মহামায়া। গৌতমের জন্ম হবার আগে রাণী মহামায়া স্বপ্ন দেখেছিলেন যেন একটি শ্বেতহস্তী তাঁর গর্ভে প্রবেশ ক'রছে! রাণীর স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে জ্যোতিষীরা সকলে গণনা ক'রে মহারাজ শুদ্ধোদনকে ব'লেছিলেন যে রাণীর গর্ভে যে পুত্র হবে তিনি—হয় সসাগরা ধরণীর রাজচক্রবর্তী হবেন, নয়ত' একজন 'বুদ্ধদেব' হবেন। 'বুদ্ধ' মানে অসীম জ্ঞান ও অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ! শাক্য বুদ্ধদেব জন্মাবার আগে অতীতযুগে কালে কালে আরও অনেক বুদ্ধদেব জন্মেছিলেন। যুগে যুগে জগতের কল্যাণ ও মানুষের মঙ্গলের জন্য এঁদের আবির্ভাব হয়।

রাণী মহামায়া যখন পূর্ণগর্ভাবস্থায় তাঁর পিতার সঙ্গে দেখা করবার জন্য দেবদহে যাচ্ছিলেন সেই সময় পথে লুম্বিনী নামে একটি উদ্যানে তিনি বিশ্রামের জন্য প্রবেশ করেন। সেখানে একটি শালগাছের তলায় বুদ্ধদেব ভূমিষ্ঠ হ'য়েছিলেন। সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি।

গৌতমের জন্মকালে তাঁর জননীকে একটুও কষ্ট পেতে হয়নি। রাণী মহামায়ার শিশুপুত্র সেদিন ভূমিষ্ঠ হয়েই সাত পা হেঁটে বলেছিল— 'এ জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছি আমি।'

রাণী আর পিত্রালয়ে গেলেন না। লুম্বিনী উদ্যান থেকেই পুত্রকে কোলে নিয়ে কপিলবস্তুতে ফিরে এলেন। ঐদিন গৌতমবুদ্ধের আরও কয়েকজন সঙ্গীরও জন্ম হয়েছিলো। তা'র স্ত্রী যশোধারা, সারথী ছন্দক প্রিয়তম অশ্ব কণ্ঠক এবং শিষ্য আনন্দ ও কালোদায়ী।

বুদ্ধদেব কপিলবস্তুর রাজপুত্ররূপে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন জেনে মহাজ্ঞানী ঋষি অসিত দেবল রাজপ্রাসাদে তাঁকে দর্শন ক'রতে এলেন, এবং শিশুকে দেখে প্রণাম ক'রে ব'লে গেলেন যে—"এই ছেলে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে 'বুদ্ধ' নামে খ্যাত হবেন, কিন্তু আমি তখন জীবিত থাকবোনা এই আমার দুঃখ।"

মহারাজ শুদ্ধোদন পঞ্চম দিনে তাঁর পুত্রের নাম রাখলেন 'সিদ্ধার্থ।' যেদিন শিশুর নামকরণ হলো—সেদিন মন্দিরের ভিতরের যতো পাথরের তৈরী দেবদেবীর মূর্ত্তি মাথা নত ক'রে শিশু সিদ্ধার্থকে তাঁদের প্রণাম জানালেন।

কিন্তু রাজপুত্রের এই নাম রাখার উৎসব শেষ হ'তে না হ'তেই সপ্তম দিনে তাঁর জননী রাণী মহামায়াদেবীর মৃত্যু হ'লো। রাজপুরী বিষাদাচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়লো। তখন মহারাজ শুদ্ধোদনের দ্বিতীয়া মহিষী রাণী মহা-প্রজাপতি শিশু সিদ্ধার্থকে লালনপালন করবার ভার নিলেন। কারণ,

রাণী মহাপ্রজাপতী ছিলেন রাণী মহামায়ারই বোন্। এঁর আর এক নাম ছিল মহাগৌতমী।

একবার রাজ্যের হলকর্ষণ উৎসবে বালক সিদ্ধার্থ গিয়ে একটি জম্বু-বৃক্ষের তলায় বসে একমনে ধ্যান ক'রতে সুরু করেছিলেন, সারাদিনের মধ্যে পূবের সূর্য্য পশ্চিমে হেলে পড়া সত্বেও সে গাছের ছায়া কিন্তু তাঁর পুত্রকে ছেড়ে কোথাও ন'ড়লোনা দেখে মহারাজ শুদ্ধোদন তাঁর সেই বালক পুত্রকে অসামান্য জেনে প্রণাম না ক'রে থাকতে পারলেন না।

বিশ্বামিত্র নামে এক আচার্য্য পণ্ডিতের কাছে সিদ্ধার্থ বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন এবং পাঠাভ্যাস কালে নিজের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দেখিয়ে সকলকে বিস্মিত ক'রে দিয়েছিলেন। ধনুর্বিদ্যাতেও তিনি অসামান্য দক্ষতা দেখিয়ে অন্যান্য সমবয়সী রাজকুমারদের, এমন কি—তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠদেরও পর্য্যন্ত প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিয়েছিলেন। কোলিরাজ সুপ্রবুদ্ধের ছেলে দেবদত্ত তাঁর কাছে প্রতিবার হে'রে যেতো ব'লে সিদ্ধার্থের উপর তার ছেলেবেলা থেকেই একটা বিদ্বেষ জন্মেছিল। দেবদত্তের মনে এই ঈর্ষ্যা তার বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত ছিল।

ষোলোবছর বয়সে কোলিরাজ সুপ্রবুদ্ধের সুন্দরী কন্যা রাজকুমারী যশোধারার সঙ্গে মহাসমারোহে সিদ্ধার্থের বিবাহ হ'য়েছিল। বিবাহের পর রাজপুত্র দীর্ঘকাল বেশ সুখেই ছিলেন। হঠাৎ একদিন সারথী ছন্দকের সঙ্গে নগরের রাজপথে বেড়াতে বেরিয়ে তিনি দেখতে পেলেন এই মানুষ একদিন কী রকম বুড়ো ও অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়ে। রোগে শোকে দুঃখে দৈন্যে সে কী রকম কষ্ট পায়। সেদিন জীবনে প্রথম তিনি চোখের সামনে একজন মানুষের মৃত্যুও দেখতে পেলেন। এইসব দেখে শুনে তাঁর ভয়ানক মন খারাপ হ'য়ে গেলো। তাঁর আর সংসারে থাকতে ইচ্ছে হলোনা। এই সময় রাজকুমার সিদ্ধার্থের একটি পুত্র হ'লো। তার নাম

রাহুল। রাহুল জন্মাবার অল্পদিন পরেই এক আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাত্রে তাঁর প্রিয়তম অশ্ব কণ্ঠকের পৃষ্ঠে উঠে ছন্দককে সঙ্গে নিয়ে তিনি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে স্ত্রী পুত্রকে ফেলে বনে চলে গেলেন তপস্যা ক'রতে। তখন তাঁর বয়স ঊনত্রিশ বৎসর। অনোমা নদীর তীরে পৌঁছে তিনি বহুমূল্য রাজবেশ ও রত্ন-অলঙ্কার খুলে ছন্দকের হাতে দিয়ে কণ্ঠকের পিঠ থেকে নেমে পায়ে হেঁটে কোথায় কোন্ নিরুদ্দেশে চলে গেলেন। ছন্দক কাঁদতে কাঁদতে নগরে ফিরে এলো, কিন্তু কণ্ঠক প্রভুর শোকে প্রাণত্যাগ করলে।

বোধিবৃক্ষের তলায় পদ্মাসনে ব'সে ছ'বছর ধ'রে কঠোর তপস্যার পর সিদ্ধিলাভ ক'রে তিনি ভগবান গৌতমবুদ্ধ হ'লেন। তখন অতীতের কথা, বর্ত্তমানের কথা, ভবিষ্যতের কথা কিছুই আর তাঁর জানতে বাকী রইলোনা। সেই সময় ভক্তিমতী সুজাতা সুমিষ্ট পায়েস রেঁধে সুবর্ণ পাত্র পূর্ণ ক'রে তার দাসী পূর্ণার হাতে দিয়ে বুদ্ধদেবের সেবার জন্য পাঠিয়েছিলো। বুদ্ধদেব সুজাতার পাঠানো সেই পরমান্ন বেশ খুশী হ'য়ে খেয়েছিলেন।

গৌতমবুদ্ধ কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর সকল মানুষের মঙ্গল কামনায় তাঁর নবধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচারে ব্রতী হলেন। একে একে তাঁর বহু শিষ্য সংগ্রহ হ'লো। তিনি তাঁদের নিয়ে একটি সঙ্ঘ স্থাপন ক'রলেন। এবং সেখান থেকে তাঁদের প্রত্যেককে তিনি দেশ বিদেশে পাঠালেন বৌদ্ধ ধর্ম্মশিক্ষা দেবার জন্য।

তারপর তিনি রাজগৃহ নগরে এসে মগধের মহারাজ বিম্বিসারকে তাঁর শিষ্য করলেন। মহারাজ বিম্বিসার গৌতমবুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যগণের বাসের জন্য তাঁর 'বেণুবন' নামে সুন্দর-বাগানখানি দান করলেন। এই সময় তাঁর পিতা মহারাজ শুদ্ধোদন তাঁকে কপিলবস্তুতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ক্রমাগত দূত পাঠাতে লাগলেন। কিন্তু তারা সকলেই

বুদ্ধদেবের কাছে এসে তাঁর শিষ্য হ'য়ে গেলো ; কেউ আর ফিরলোনা। পরে ভক্তশিষ্য কালোদায়ীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি কপিলবস্তু নগরের সন্নিকটে ন্যগ্রোধারামে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে শাক্যবংশীয় সকলকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজ শুদ্ধোদন গৌতমবুদ্ধের সম্বর্দ্ধনার জন্য উপস্থিত হ'লেন। পুত্রকে প্রণাম জানিয়ে মহারাজ বহুসমাদরে তাঁর অভ্যর্থনা করলেন।

গৌতমবুদ্ধ কপিলবস্তু নগরে ভিক্ষার জন্য যেদিন প্রবেশ করলেন, রাজপ্রাসাদের বাতায়ন থেকে যশোধারা সে দৃশ্য দেখে মনে ভারী কষ্ট পেলেন। তিনি স্বামীর এই ভিক্ষা ক'রে বেড়ানোর প্রতিবাদ ক'রে ব'ললেন—'রাজপুত্রের পক্ষে নগরবাসীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা শোভা পায় না।' কিন্তু বুদ্ধদেব ব'ললেন—"ভিক্ষাই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর জীবন ধারণের একমাত্র উপায়।"

যশোধারা পুত্র রাহুলকে বুদ্ধদেবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। রাহুল তার জননীর উপদেশ মতো পিতাকে এসে ব'ললে—"পিতৃধনে পুত্রের অধিকার আছে। আপনি তপস্যার দ্বারা যে সম্পদ অর্জ্জন ক'রেছেন আমাকেও তার অধিকারী করুন।" বুদ্ধদেব পুত্রের অনুরোধ শুনে তাকে ভিক্ষুব্রতে দীক্ষা দিলেন। মহারাজ শুদ্ধোদন এজন্য দুঃখে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হ'য়ে পড়লেন, তখন বুদ্ধদেব প্রতিজ্ঞা করলেন যে ভবিষ্যতে আর কখনো কাউকে তার মাতাপিতার সম্মতি ব্যতীত সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষা দেবেন না।

তারপর কপিলবস্তু থেকে তিনি আবার রাজগৃহে ফিরে এলেন। পথে 'আনন্দ' 'দেবদত্ত' প্রভৃতি শাক্যবংশীয় ও অন্যান্য রাজকুমারদের এবং উপালি নামে এক নাপিতকে শিষ্যরূপে গ্রহণ ক'রে তাদের প্রব্রজ্যা দিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মে সন্ন্যাসী হওয়াকেই 'প্রব্রজ্যা' নেওয়া বলে।

রাজগৃহে এবার শ্রাবস্তীবাসী শ্রেষ্ঠী সুদত্ত গৌতমবুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রলেন। ইনিই পরে ভিক্ষু অনাথপিণ্ডদ্ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে-ছিলেন। অনাথপিণ্ডদ্ তাঁর জেতবনে একটি মহাবিহার নির্ম্মাণ করিয়ে বৌদ্ধ-সঙ্ঘকে দান ক'রেছিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে মগধের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক জীবক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। জীবকের সুচিকিৎসার গুণে একাধিকবার গৌতমবুদ্ধের পীড়া আরোগ্য হয়েছিল।

প্রবল পরাক্রান্ত লিচ্ছবিরাজাদের রাজধানী বৈশালীতে যেবার মহামারী সুরু হ'লো, মড়ক শান্তির জন্য লিচ্ছবিরা এসে প্রভু গৌতমের শরণ নিলে। বুদ্ধদেব বৈশালীতে গিয়ে মড়কের শান্তি করলেন। লিচ্ছবিরাজারা তখন সদলে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলো।

কিছুকাল পরে বুদ্ধদেব তাঁর পিতা শুদ্ধোদনের কঠিন পীড়ার সংবাদ পেয়ে আকাশ পথে কপিলবস্তুতে এলেন। বুদ্ধদেবের শিষ্যরাও কেউ কেউ সাধন বলে সিদ্ধিলাভ ক'রে আকাশপথে যাতায়াত ক'রতে পারতেন। গৌতমের কপিলবস্তু নগরে আসবার পরই মহারাজ শুদ্ধোদনের মৃত্যু হ'লো। মৃত্যুর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব পিতাকে সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে দিব্য জ্ঞান দিয়েছিলেন।

রাণী মহাপ্রজাপতি স্বামীর মৃত্যুর পর সংসার ত্যাগ ক'রে বৌদ্ধসঙ্ঘের ভিক্ষুণী হ'য়ে থাকবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন। বুদ্ধদেব স্ত্রীলোকদের সঙ্ঘের মধ্যে স্থান দিতে চাইলেন না। তিনি বৈশালীতে চলে গেলেন। রাণী এবং তাঁর সহচরীরা প্রব্রজ্যা নেবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প ক'রে তাঁদের মাথার চুল কেটে ফেলে, মূল্যবান বসন ভূষণ, বিলাসিতা, আরাম সব ত্যাগ ক'রে পদব্রজে বৈশালীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন প্রিয়শিষ্য আনন্দের একান্ত অনুরোধে বুদ্ধদেব তাঁদের

সঙ্ঘের মধ্যে স্থান দিতে বাধ্য হ'লেন। রাজ্ঞী মহাপ্রজাপতি এরপর থেকে শুধু মহাগৌতমী নামে পরিচিতা হয়েছিলেন।

বৈশালী থেকে তিনি অল্প দিন পরেই শ্রাবস্তীতে ফিরে এলেন। সেখান থেকে যখন আবার রাজগৃহে উপস্থিত হ'লেন তখন নৃপতি বিম্বিসারের আর এক রাণী—রাজ্ঞী ক্ষেমা রাজ্যসুখ ছেড়ে বৌদ্ধসঙ্ঘে এসে প্রবেশ করলেন। এই রাজ্ঞী ক্ষেমাই পরে প্রভু গৌতমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা শিষ্যা অগ্রশ্রাবিকা ব'লে পরিগণিতা হয়েছিলেন।

রাজগৃহের নিকটস্থ দক্ষিণগিরির একনালা গ্রামে ভরদ্বাজ নামে এক জন কৃষিজীবী ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থী বুদ্ধদেবকে বলেছিল—"আমি মাটিতে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করি, বীজ বপন করি, এবং তাতে যে শস্য জন্মায় আমি তাই খেয়ে জীবন ধারণ করি; তুমিও সেই রকম ক'রো না কেন?" বুদ্ধদেব তাকে বলেন—"আমিও তাই করি! আমিও ভূমি কর্ষণ করি, বীজ বপন করি, এবং তাই থেকেই আমার খাদ্য সংস্থান হয়। আমি শ্রদ্ধারূপ বীজ বপন করি, ধ্যান আমার বৃষ্টিধারা, বিনয় আমার লাঙল, মন আমার হাল, ধারণা তারই ফলক, সত্যপরায়ণতা আমার ক্ষেত্র, বীর্য্য আমার বলদ এবং নির্ব্বাণ আমার শস্য!" বুদ্ধদেবের এই কথা শুনে কৃষিজীবী ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

বুদ্ধদেবের যখন বাহাত্তর বৎসর বয়স সেই সময় দেবদত্ত তাঁর বিরোধী হয়ে বিপক্ষতাচরণ করেন। মহারাজ বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুর সাহায্যে সে গৌতমের প্রাণনাশের পর্য্যন্ত চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হ'তে পারেনি।

উনআশি বৎসর বয়সে বুদ্ধদেব রাজগৃহের সন্নিকটস্থ গৃধ্রকূট পাহাড় থেকে নেমে 'নালান্দায়' এলেন। নালান্দায় বৌদ্ধদের যে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। সেখান থেকে তিনি যখন পাটলিগ্রামে এসে

বাস করেন সেই সময় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এই পাটলিগ্রাম একদিন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর হয়ে উঠবে—কিন্তু পরে আবার তা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁর সেই ভবিষ্যবাণী বর্ণে বর্ণে সফল হ'য়েছিল। পাটলিগ্রাম একদিন 'পাটলিপুত্র' নামে মৌর্য্যদের প্রসিদ্ধ রাজধানী হ'য়েছিল। আজ তা ধ্বংস হ'য়ে গেছে। তারপর তিনি বৈশালীতে চলে গেলেন। সেখানে সুন্দরী শ্রেষ্ঠা আম্রপালীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে তার আম্রকাননে অবস্থান করলেন এবং তার গৃহে অতিথি হয়ে ভোজনও করলেন। আম্রপালী বৌদ্ধ সঙ্ঘকে তার আম্র-কানন দান করলে।

আশি বৎসর বয়সে বুদ্ধদেব অত্যন্ত পীড়িত ও দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েছিলেন। এই সময় তিনি কুশীনগরে আসছিলেন। হিরণ্যবতী নদীর অপর পারে কুশীনগরের উপান্তে দুটি শালগাছের মাঝখানে উত্তরদিকে মাথা ক'রে শুয়ে তিনি প্রিয়শিষ্য আনন্দকে বিবিধ অন্তিম উপদেশ দিয়ে ধ্যানস্থ হ'লেন এবং পরিনির্ব্বাণ লাভ ক'রলেন।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুকালে ভূমিকম্প ও বজ্রপাত হয়েছিল। শিষ্যরা কুশী-নগরের মল্লদের সাহায্য নিয়ে বহুযত্নে তাঁর সৎকারের আয়োজন করলেন, কিন্তু সাতদিন ধ'রে ক্রমাগত চেষ্টা করেও কিছুতেই তাঁরা কেউ চিতায় অগ্নি সংযোগ ক'রতে পারলেন না, শেষে বুদ্ধশিষ্য মহাকশ্যপ সেখানে এসে উপস্থিত হবার পর গৌতমের চিতা আপনিই জ্বলে উঠলো!

বুদ্ধদেবের নখ, দাঁত, চুল ও চিতাভস্ম নিয়ে গিয়ে উক্ত শিষ্যরা নানাস্থানে যেসব বড় বড় স্তূপ ও মন্দির নির্ম্মাণ করেছিলেন, আজও ভারতবর্ষে ও ভারতের বাইরে অনেক জায়গায় তার ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার হ'চ্ছে।

নানাদেশের নানাস্থানের সঙ্ঘ বা বিহারে ব'সে ভিক্ষু, শ্রমণ ও শিষ্যদের উপদেশ ও শিক্ষা দেবার সময় কোনো একটা কিছু ঘটনা অবলম্বন ক'রে দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রভু গৌতম আপনার পূর্ব-জন্মের এক একটি কাহিনী নিজমুখে তাঁদের ব'লতেন। তারই গুটি ক'য়েক এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

দেবদত্ত

বুদ্ধদেবের প্রধান শত্রু ছিল—দেবদত্ত। অথচ এই দেবদত্তর সঙ্গে বুদ্ধদেবের খুব নিকট-আত্মীয়তা ছিল।

বুদ্ধদেব ছিলেন কপিলাবাস্তুর মহারাজ শুদ্ধোদনের পুত্র। তিনি যখন যুবরাজ সিদ্ধার্থ নামে খ্যাত ছিলেন তখন তাঁর মাতুল কন্যা যশোধারার সঙ্গে বিবাহ হ'য়েছিল। সে কালে এ দেশে মামাতো ভাই বোনে বিয়ে হ'তো। যশোধারা ছিলেন কোলিরাজ সুপ্রবুদ্ধের একমাত্র কন্যা। পরমা সুন্দরী ও অশেষ গুণবতী ছিলেন তিনি। দেবদত্ত তাঁরই জ্যেষ্ঠ সহোদর, অর্থাৎ বুদ্ধদেবের আপন মামাতো ভাই।

সিদ্ধার্থ যখন সাধন-বলে গৌতমবুদ্ধ হ'য়ে দেশে ফিরে আসেন, সেই সময় দু'তিন বৎসরের মধ্যেই আনন্দ, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি শাক্য-রাজকুমারদের সঙ্গে

দেবদত্তও বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সাধন-বলে দেবদত্ত অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন হ'য়ে উঠেছিল। সে অনায়াসে শূন্যে উড়ে চলে যেতে পারত। কিন্তু তার স্বভাব ছিল অত্যন্ত ক্রূর। তাই সাধন-বলে পাওয়া নিজের অসাধারণ শক্তির সে প্রায়ই অপব্যবহার করত। শেষে, বুদ্ধদেবের চেয়েও বড় হবার আশায় দেবদত্ত বুদ্ধদেবকে অগ্রাহ্য করে নিজেই একটি পৃথক্ দল গড়ে তোলবার চেষ্টা ক'রতে লাগ্‌লো।

বুদ্ধদেবের বয়স তখন প্রায় বাহাত্তর বছর হ'য়েছে। সেই সময় ভারতের যাঁরা সব চেয়ে শক্তিশালী রাজা মগধেশ্বর বিম্বিসার ও কোশলের অধিপতি প্রসেনজিৎ দু'জনেই ছিলেন বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য। কাজে কাজেই দেবদত্ত তাদের কাছে কোন সাহায্য পেলে না। তখন সে নানা ছলে ও কৌশলে ভুলিয়ে বিম্বিসারের ছেলে অজাতশত্রুকে বশ ক'রে ফেললে! অজাতশত্রু সে সময় মগধের যুবরাজ। দেবদত্তর জন্য অজাতশত্রু একটি 'বিহার' তৈরী ক'রে দিলেন। বৌদ্ধযুগে সন্ন্যাসীদের বাসগৃহকে বলা হ'তো 'বিহার'। অজাতশত্রুর অনুগ্রহে দেবদত্তের বিহারে নিত্য পাঁচশত শিষ্যের জন্য আহার্য্য পাঠাবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল।

কিন্তু এই সময় হঠাৎ দেবদত্তর যোগবল নষ্ট হ'য়ে গেল! দেবদত্ত ভয় পেয়ে বুদ্ধদেবের সঙ্গে একটা আপোষে মিটমাট ক'রে নিতে চাইলে। বুদ্ধদেব তাকে তার প্রার্থিত ক্ষমতা ও উচ্চপদ দিতে অস্বীকৃত হ'লেন। তখন দেবদত্ত বুদ্ধদেবের একজন ঘোরতর শত্রু হ'য়ে উঠলো। নানা রকম উপায়ে সে বুদ্ধদেবের বিপক্ষতা ক'রতে লাগ্‌লো।

প্রথমেই দেবদত্ত কুপরামর্শ দিয়ে অজাতশত্রুর পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করাবার জন্য তাকে উত্তেজিত করে তুললে। অজাতশত্রু পিতাকে বধ ক'রতে গিয়ে তাঁর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত ক'রতে পারলে না। শেষে দেবদত্তর পরামর্শে সে পিতাকে বন্দী করে তাঁকে অনাহারে মারবার ব্যবস্থা ক'রলে।

বিম্বিসারের মৃত্যুর পর অজাতশত্রু যখন রাজা হ'লো, দেবদত্ত তখন রাজার সাহায্য নিয়ে বুদ্ধদেবের প্রাণ নাশ করবার চেষ্টা ক'রতে লাগ্‌লো। এক দিন সে রাজার কাছে পাঁচজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ সৈন্য চেয়ে নিলে। দেবদত্তর মতলব ছিল এদের দিয়ে বুদ্ধদেবকে হত্যা ক'রবে, তারপর বিষ খাইয়ে এদেরও মেরে ফেলবে; তাহ'লে কেউ আর দেবদত্তর এই

কুকাজের কথা জানতে পারবে না। বুদ্ধদেবকে মারতে পারলে দেবদত্তই তখন ভারতের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মনেতা হ'য়ে উঠবে। কিন্তু, দেবদত্তর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল না। তীরন্দাজ সৈন্যদের সেনাপতি দূর থেকে যখন বুদ্ধদেবের বক্ষ লক্ষ্য করে অব্যর্থ সন্ধানে তীর ছুঁড়লে, সে তীর বুদ্ধদেবের দিকে না গিয়ে ঘুরে এলো যারা তীর ছুঁড়ছে তাদেরই দিকে। তারা যতবার চেষ্টা ক'রলে ততবারই এই রকম হ'লো।

এই আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘট্‌তে দেখে তীরন্দাজরা ভয় পেয়ে বুদ্ধদেবের কাছে গিয়ে তাঁকে সব কথা ব'লে তাঁর ক্ষমা চেয়ে নিলে এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রলে।

দেবদত্ত কিন্তু তার দুরভিসন্ধি ছাড়লে না। কিছু দিন পরে সে শুনলে যে বুদ্ধদেব গৃধ্রকূট পাহাড়ের ধার দিয়ে এক জায়গায় যাবেন। দেবদত্ত মনে ক'রলে এইবার বুদ্ধদেবকে মারবার খুব ভাল সুযোগ পাওয়া গেছে। পাহাড়ের উপর থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর যন্ত্র দিয়ে ঠেলে বুদ্ধদেবের মাথায় গড়িয়ে ফেলে দিতে পারলেই সেই পাথর চাপা পড়ে বুদ্ধের প্রাণ নাশ হবে। এই মতলব মতো দেবদত্ত সব ব্যবস্থাও ক'রলে, কিন্তু

সময় গুঁড়িয়ে গেল, বুদ্ধদেবের গায়ে

লাগ্‌লো না। কেবল মাত্র তাঁর পায়ের একটি আঙুলে একটু আঘাত লাগ্‌লো। সে আঘাতে বুদ্ধদেবের পায়ে যে সামান্য ক্ষত হ'য়েছিল, তাঁর পরম ভক্ত শিষ্য জীবকের চিকিৎসার গুণে শীঘ্রই তা আরোগ্য হ'য়ে গেলো।

দেবদত্ত এবারও বিফল মনোরথ হ'য়ে ফিরে এলো এবং বুদ্ধদেবকে বিনাশ করবার নূতন কোনও উপায় খুঁজতে লাগ্‌লো।

বুদ্ধদেব প্রত্যহ সকালে রাজপথে ভিক্ষার জন্য বেরুতেন; দেবদত্ত অনেক ভেবে চিন্তে স্থির ক'রলে যে অজাতশত্রুর 'নালাগিরি' নামে যে প্রকাণ্ড হাতী আছে, সেটাকে একদিন মদ খাইয়ে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়াবে, মাতাল হাতীর সামনে পড়লেই বুদ্ধদেবকে সে শুঁড়ে জড়িয়ে তুলে আছাড় দিয়ে মেরে ফেলবে, নয় পদদলিত করে দিয়ে চ'লে যাবে।

দেবদত্তর এই দুরভিসন্ধির কথা বুদ্ধদেবের কাণে এলো। যে দিন দেবদত্ত 'নালাগিরি'কে মদ খাইয়ে রাজপথে ছেড়ে দেবে স্থির ক'রেছিল, বুদ্ধদেবের সমস্ত শিষ্য সেদিন তাঁকে ভিক্ষায় বেরুতে বারণ ক'রলে। কিন্তু তিনি কারও নিষেধ ও মিনতি না শুনে যথা সময়ে রাজপথে ভিক্ষায় বেরুলেন।

এদিকে অজাতশত্রুর অতিকায় ঐরাবত 'নালাগিরি' মদমত্ত হয়ে প্রচণ্ড বেগে শুঁড় নাড়তে নাড়তে, পথের ছু'ধারের ঘর বাড়ী দোকান পাট সমস্ত চুরমার ক'রতে ক'রতে এগিয়ে আসছিল। একটি অসহায় দরিদ্রা স্ত্রীলোক কোলে একটি শিশু সন্তানকে নিয়ে রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ নালাগিরির সামনে এসে পড়তেই মাতাল নালাগিরি তাদের শুঁড়ে জড়িয়ে ধ'রতে গেলো। তখন ভিক্ষার্থী বুদ্ধদেবও সেখানে এসে পড়েছিলেন। তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে নালাগিরিকে উদ্দেশ ক'রে ব'ললেন—"আমাকে মারবার জন্যই যখন দেবদত্ত তোমাকে আজ এতো মদ খাইয়েছে এবং আমি নিজেই যখন তোমার কাছে উপস্থিত রয়েছি তখন অকারণ আর এ অনাথা নারীর উপর তোমার আক্রোশ কেন? ওকে ছেড়ে দিয়ে তুমি আমাকে বধ করো।"

বুদ্ধদেবের এই কথাটি শোনবামাত্র 'নালাগিরি' শান্ত হ'য়ে গেলো। সে অতি সসম্ভ্রমে মাথা লুটিয়ে শুঁড় দিয়ে বুদ্ধদেবের চরণ-বন্দনা ক'রলে।

রাজপথের চতুর্দ্দিক তখন লোকে লোকারণ্য হ'য়ে উঠেছিল। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখবামাত্র সেই জনসমুদ্রে ভেদ ক'রে সেই মুহূর্ত্তে এক বিরাট জয়ধ্বনি যেন সমস্ত

আকাশকে কাঁপিয়ে তুললে! "প্রভু বুদ্ধের জয়" ব'লতে ব'লতে পথিকদের যার অঙ্গে যা অলঙ্কার ছিল, যার কাছে যা অর্থ ছিল, সমস্ত তারা 'নালাগিরি'কে উপহার দিতে লাগ্‌লো। বুদ্ধদেব সেদিন 'নালাগিরি'র নূতন নামকরণ ক'রলেন—"ধনপালক"।

সেদিন থেকে দেবদত্তর দুরভিসন্ধি সকলে জানতে পেরে তাকে শহর শুদ্ধ লোক ঘৃণার চক্ষে দেখতে লাগ্‌লো। এমন কি দেবদত্তর শিষ্যদের উপরও তার প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমে নষ্ট হ'য়ে গেলো। মহারাজ অজাতশত্রু পর্য্যন্ত দেবদত্তর উপর বিরক্ত হ'য়ে উঠলেন। রাজবাড়ী থেকে প্রতিদিন তাকে যে পাঁচ-শত শিষ্যের জন্য ভোজন-সামগ্রী পাঠান হ'তো তাও বন্ধ হ'য়ে গেলো। তখন শিষ্যরাও সকলে তাকে পরিত্যাগ ক'রে চলে গেলো। দেবদত্ত মহা বিপদে পড়্‌লো। অব-শেষে ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে দেবদত্ত নিজেই ভিক্ষা ক'রতে বেরুলো। কিন্তু নগরবাসীরা কেউ তাকে ভিক্ষা দিলে না। সবাই "দূর্ দূর্" ক'রে তাড়িয়ে দিলে। জন কতক লোক উত্তেজিত হ'য়ে উঠে তার ভিক্ষাপাত্র কেড়ে নিয়ে ভেঙে দিলে।

দেবদত্ত তখন নিরুপায় হ'য়ে বুদ্ধদেবের কাছে গিয়ে

ব'ললে, "আমি আপনার সম্প্রদায়ে পুনরায় যোগ দিতে চাই, কিন্তু আপনাদের তার আগে ভিক্ষুদের জন্য গুটি-কয়েক নূতন নিয়ম ক'রতে হবে।" দেবদত্ত কি নূতন নিয়ম ক'রতে চান বুদ্ধদেব জানতে চাইলেন। দেবদত্ত ব'ললে—"ভিক্ষুরা শ্মশানে ফেলে-দেওয়া বস্ত্র ছাড়া অন্য কোনো বস্ত্র ব্যবহার ক'রতে পারবে না। ভিক্ষুরা কখনো মাংস খেতে পাবে না।" বুদ্ধদেব মৃদু হাস্য ক'রে ব'ললেন, "তোমার অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব, দেবদত্ত। আমার শিষ্যগণের মধ্যে অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত ভদ্রবংশজাত, তারা কেউ শ্মশানে ফেলে-দেওয়া কাপড় কুড়িয়ে এনে পরতে পারবে না। তা'ছাড়া ভিক্ষুরা যদি কারুর বস্ত্রদান গ্রহণ না করে, তাহ'লে গৃহী-উপাসকদের দানধর্ম্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা সাধুসেবার ব্যাঘাত ঘটবে। এ নিয়ম কিছুতেই হ'তে পারে না বন্ধু!"

তারপর ভিক্ষুদের মাংস ভোজন নিষেধ করা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব ব'ললেন, "ভিক্ষা দ্বারা যাদের জীবিকা নির্ব্বাহ ক'রতে হবে,—তাদের খাদ্য সম্বন্ধে বিচার করা চলবে না। যদি কেউ তাদের মাংস খেতে দেয়, তাহ'লে জীবহত্যার পাপ হবে দাতার, যে খাবে তার নয়।

তাছাড়া দেশভেদে জাতিভেদে যখন খাদ্যেরও প্রভেদ দেখা যায় তখন ভিক্ষুর পক্ষে এ-খাদ্য গ্রাহ্য বা ও-খাদ্য অগ্রাহ্য এ নিয়ম করা অনুচিত।"

দেবদত্তর অনুরোধ বুদ্ধদেব রক্ষা ক'রলেন না। তখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে বুদ্ধ-শিষ্যদের মিথ্যা কথায় প্ররোচিত ক'রে তাঁর সম্প্রদায় ভেঙে দেবার চেষ্টা ক'রতে লাগ্‌লো। দেবদত্তর প্রাণপণ চেষ্টায় জনকতক ভিক্ষু বুদ্ধদেবের আশ্রম ত্যাগ ক'রে চলে এলো বটে, কিন্তু, অল্পদিনের মধ্যেই তারা আবার ফিরে এলো। তখন দেবদত্ত একেবারে হতাশ ও নিরুপায় হ'য়ে দারুণ মনস্তাপে, অনাহারে, দুশ্চিন্তায় কষ্ট পেয়ে শেষে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হ'লো।

এই সময় দেবদত্তর মনে গভীর অনুতাপ এলো। সে স্থির করলে এবার জেতবনে গিয়ে বুদ্ধদেবের পায়ে ধ'রে ক্ষমা চেয়ে তাঁরই শরণ নেবে। পীড়িত দেবদত্ত তার সঙ্কল্প অনুসারে কাজ করবার জন্য একখানি পাল্‌কী চড়ে জেতবনে বুদ্ধদেবের কাছে চল্‌লো। বুদ্ধদেব এ সংবাদ জান্‌তে পেরে শিষ্যদের ব'ললেন—"কিন্তু এ তার একান্তই দুরাশা! সে তো আমার দর্শন এজন্মে আর পাবে না।"

প্রকৃতপক্ষে ঘট্‌লও তাই। দেবদত্ত জেতবনের কাছে গিয়ে পদব্রজে বুদ্ধদেবের নিকট যাবে ব'লে পাল্‌কী থেকে যেই ভূমিতে পদার্পণ ক'রলে, অমনি সেখানকার মৃত্তিকা ফেটে গিয়ে নরকের অগ্নিশিখা নির্গত হ'য়ে দেবদত্তকে দগ্ধ করতে লাগ্‌লো।

প্রাণের দায়ে দেবদত্ত পরিত্রাহী চিৎকার ক'রতে লাগ্‌লো—কিন্তু, দেবদত্তকে রক্ষা ক'রতে কেউ এল না। বেচারি সেই নরকের আগুনে পুড়ে মরে গেল।

দু'হাজার বছর আগে মগধের মহারাজা ছিলেন নৃপতি বিম্বিসার। প্রভু বুদ্ধের তিনি ছিলেন একজন প্রধান ভক্ত। অজাতশত্রু এই মগধের মহারাজা বিম্বিসারের পুত্র।

মগধের মহারাণী কোশল-রাজকন্যা বৈদেহীর গর্ভে যেদিন অজাতশত্রুর জন্ম হ'লো, সেদিন মগধ-রাজ্যে মহা উৎসব লেগে গেলো। মহারাজ বিম্বিসার রাজ্যের দীন-দুঃখীদের সবাইকে সেদিন প্রচুর অন্নবস্ত্র ও ধনরত্ন দান ক'রলেন।

দৈবজ্ঞ জ্যোতিষীরা এসে রাজকুমারের ভাগ্য-গণনা ক'রতে ব'সলেন। কিন্তু, গণনার ফলে তাঁরা যা জানতে পারলেন, তাতে ভয়ে তাঁদের সকলের মুখ একেবারে শুকিয়ে গেলো।

মহারাজ বিম্বিসার উৎকণ্ঠিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর-লেন—"কেমন দেখ্ছেন ?"

জ্যোতিষীদের মুখে কারুর কথা নেই। মহারাজ বিম্বি-সার বার বার জিজ্ঞাসা ক'রেও কোনও উত্তর না পেয়ে বুঝ্লেন, জ্যোতিষগণনার ফল ভাল নয় ব'লেই দৈবজ্ঞেরা তাঁকে ব'লতে ভয় পাচ্ছে। মহারাজ তখন জ্যোতিষীদের অভয় দিয়ে সত্য কথা জানাবার জন্য আদেশ ক'রলেন।

জ্যোতিষীরা জোড় হাত ক'রে জানালে,—"মহারাজ, এ ছেলে বড় হ'য়ে এর পিতাকে হত্যা করবে,—সুতরাং এই ছেলের হাতেই আপনাকে প্রাণ হারাতে হবে।"

মহারাণী একথা শুনে অত্যন্ত কাতর হ'য়ে প'ড়্-লেন। রাজাকে ব'ল্লেন,—"এমন ছেলে আমি চাইনি ;—তুমি ওকে সমুদ্রে বিসর্জ্জন দাও।"

কিন্তু, মহারাজা বিম্বিসার পুত্রস্নেহে সন্তানকে ত্যাগ ক'রতে পারলেন না। অতি আদরে তাকে লালন-পালন করতে লাগ্লেন, এবং পুত্রের শুভ কামনা ক'রে তার নাম রাখলেন—অজাতশত্রু।

অজাতশত্রু শৈশবেই অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত হ'য়ে উঠলো। শক্তি ও সাহসে মগধের সমস্ত ছেলেকে সে পরাস্ত ক'রে দিতো।

দেখতে দেখতে ষোলো বৎসর কেটে গেলো। অজাতশত্রু বালক থেকে যুবক হ'য়ে উঠ্‌লো। এই সময় সেই বুদ্ধ-বিদ্বেষী, ভণ্ড-তপস্বী দেবদত্ত অজাতশত্রুর গুরু হ'য়েছিল।

মগধের মহারাজ বিম্বিসার প্রভু বুদ্ধের শিষ্য ব'লে দেবদত্ত বিম্বিসারকে দু'চক্ষে দেখতে পারতো না। বিম্বিসারকে রাজ্যচ্যুত ক'রে প্রাণে মারবার সংকল্প তার অনেকদিন থেকেই ছিলো। প্রভু বুদ্ধকে হত্যা করবার অনেক চেষ্টা ক'রেও কৃতকার্য্য হ'তে না পেরে প্রতিহিংসায় উন্মত্ত দেবদত্ত বুদ্ধদেবের প্রধান প্রধান শিষ্যদের বধ করবার জন্য ষড়যন্ত্র ক'রতে লাগ্‌লো।

মগধের যুবরাজ অজাতশত্রুর গুরু হ'য়ে দেবদত্ত তাকে কুপরামর্শ দিয়ে বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম্ম ও তার পিতা মহারাজ বিম্বিসারের অত্যন্ত বিরোধী ক'রে তুললে। কাণে বিষমন্ত্র ঢেলে সে যুবরাজ অজাতশত্রুকে বুঝিয়ে দিলে যে তার পিতার প্রাণ বধ ক'রে মগধের সিংহাসন যদি সে কেড়ে নিতে না পারে তা'হ'লে বৌদ্ধদের এই অধর্ম্মের স্রোত কিছুতেই বন্ধ হবে না।

অজাতশত্রু বুঝ্‌তে পারলে যে, নিজে রাজা হ'তে না পারলে এ রাজ্যের সে কিছুই ক'রতে পারবে না।

একদিন রাজসভা সবে মাত্র শেষ হ'য়েছে। মহারাজ তখনও সিংহাসন ছেড়ে ওঠেন নি; এমন সময় অজাতশত্রু একটা তীক্ষ্ণ বর্শা নিয়ে সেখানে ছুটে এলো পিতাকে বধ ক'রতে। কিন্তু, পিতার সৌম্য-শান্ত সহাস্য আনন দেখে সে কিছুতেই পিতার বক্ষে বর্শা বিদ্ধ করতে পারলে না,—ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেলো; সর্ব্বশরীর ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলো; হাত থেকে বর্শাটি খসে পড়ে গেল।

মহারাজ বিম্বিসার পুত্রের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে সস্নেহে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—"কি হয়েছে বৎস! তুমি কি চাও?"

অজাতশত্রু বললে,—"আমি মগধের রাজা হ'তে চাই। আপনি জীবিত থাকতে তা' সম্ভব নয় ব'লে আপনাকে......"

মহারাজ বিম্বিসার মধুর হাস্য ক'রে ব'ললেন—"তা' এর জন্য তুমি পিতৃঘাতী হবে কেন, বৎস! এই মুহূর্ত্তে আমি তোমাকে রাজ-সিংহাসন দান করলুম।"

তারপর মহাসমারোহে তিনি পুত্রের রাজ্যাভিষেক সুসম্পন্ন ক'রলেন। অজাতশত্রু মগধের রাজা হ'লো।

কিন্তু, দেবদত্ত অজাতশত্রুকে বুঝিয়ে দিলে যে

তোমার পিতা বিম্বিসার যদি জীবিত থাকে, তা'হ'লে তোমার সিংহাসন নিরাপদ নয়। তিনি আবার ভবিষ্যতে তোমার কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নিতে পারেন; —সুতরাং বিম্বিসারকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়াই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ।"

অজাতশত্রু ব'ললে,—"সে আমি পারবো না গুরুদেব! পিতার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত ক'রতে পারবো না।"

তখন দেবদত্ত তাকে পরামর্শ দিলে যে,—"বাপকে তুমি কারাগারে বন্দী ক'রে রেখে দাও; সেখানে না-খেতে পেয়ে বিম্বিসার আপনিই মারা যাবে।"

অজাতশত্রু তাই ক'রলে;—বিম্বিসার বন্দী হ'লেন। একমাত্র রাণী ছাড়া আর কোনও লোকের তাঁর সঙ্গে দেখা করবার হুকুম রইলো না।

রাণী ছেলের এই নিষ্ঠুর কাণ্ড দেখে মর্ম্মাহত হ'য়ে প'ড়েছিলেন। তিনি প্রত্যহ লুকিয়ে মহারাজের জন্য কারাগারে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যেতেন। কিন্তু, দেবদত্ত তা' জানতে পেরে অজাতশত্রুকে ব'লে কারাগারে রাণীর খাদ্য নিয়ে যাওয়া বন্ধ ক'রে দিলে।

রাণী তখন নিরুপায় হ'য়ে নিজের খোঁপার মধ্যে খাদ্যসামগ্রী গোপন ক'রে স্বামীর কাছে নিয়ে যেতে

লাগলেন। দেবদত্ত এ কথাও জানতে পারলে এবং অজাতশত্রুকে ব'লে আদেশ দেওয়ালে যে, রাণী এলোচুলে না গেলে কারাগারে প্রবেশ করতে পারবেন না।

রাণী তখন নিজের স্বর্ণ পাদুকার মধ্যে খাদ্যদ্রব্য লুকিয়ে নিয়ে কারাগারে যেতে লাগলেন; কিন্তু দেবদত্ত তা'ও ধরে ফেললে। রাণীর উপর হুকুম হ'লো যে, এর পর আর পাদুকা প'রে তিনি কারাগারে যেতে পাবেন না।

রাণী মহা চিন্তিত হ'য়ে প'ড়লেন। কি ক'রে স্বামীর প্রাণরক্ষা ক'রবেন ভেবে ভেবে শেষে নিজের সর্ব্বাঙ্গে মধু ও অন্য প্রকার পুষ্টিকর খাদ্যের রস মেখে নিয়ে কারাগারে যেতে লাগ্‌লেন। অনাহারে কাতর বিম্বিসার পত্নীর অঙ্গ হ'তে সেই মধু ও রস লেহন ক'রে কোনও প্রকারে প্রাণধারণ ক'রছিলেন। কিন্তু দেবদত্তের তা' সহ্য হ'লো না। সে এবার অজাতশত্রুকে ব'লে রাণীর কারাগারে যাওয়া একেবারে নিষেধ ক'রে দিলে।

মহারাণী পুত্রের নিকট অনেক কান্নাকাটি অনুনয়-বিনয় করলেন, কিন্তু কোনও ফল হ'লো না। নিজেরই

রাজ্যে আপন পুত্রের হাতে বন্দী হ'য়ে কারাগারে মহারাজ বিম্বিসার অনাহারে তিলে তিলে প্রাণ হারা'লেন। অজাতশত্রুর পিতৃঘাতী নাম সার্থক হ'লো।

যেদিন মহারাজ বিম্বিসার মারা গেলেন, সেই দিনই অজাতশত্রুর একটি পুত্র হ'লো। পুত্রস্নেহের আস্বাদ পেয়ে অজাতশত্রুর মনে হ'লো, আমি যেদিন জন্মে-ছিলেম আমার পিতারওতো তা' হ'লে এই রকম আনন্দ হ'য়েছিলো! ছেলের প্রতি আমার মনে যেমন একটা মায়া হচ্ছে—আমার জন্য তাঁরও তো প্রাণে এমনি মায়া ছিলো!

অজাতশত্রু তৎক্ষণাৎ নিজে ছুটে গিয়ে কারাগার থেকে পিতাকে মুক্ত ক'রে আনতে গেলো, কিন্তু গিয়ে দেখ্‌লে পিতা সেখানে শৃঙ্খলিত অবস্থায় অনাহারে প্রাণত্যাগ ক'রেছেন।

অজাতশত্রুর মনে ভয়ানক কষ্ট হ'লো; পিতার শোকে তার প্রাণে দারুণ অনুতাপ এলো। কিন্তু দেবদত্তের চক্রান্তে সে অনুতাপ স্থায়ী হ'লো না; নানা-প্রকার আমোদ-প্রমোদের আয়োজন ক'রে দেবদত্ত অজাতশত্রুকে পিতৃশোক ভুলিয়ে দিলে।

দেবদত্ত এবার অজাতশত্রুর সাহায্যে প্রভু বুদ্ধদেবের

প্রাণনাশের চেষ্টা করতে লাগ্‌লো ;—কিন্তু কিছুতেই সফল হ'তে পারলে না।

ক্রমে অজাতশত্রুও আর দেবদত্তকে মানতো না ;—রাজসভায় তার সমস্ত প্রতিপত্তি চলে গেলো। শহর শুদ্ধ লোক তার পিছনে লাগ্‌লো। তাকে প্রায় ক্ষেপিয়ে তোলবার যোগাড় ক'রলে। তখন দেবদত্ত প্রাণের দায়ে বুদ্ধদেবের শরণ নিতে গেলো।

কিন্তু, তথাগতের কাছে গিয়ে সে পৌঁছতে পারলে না। জেতবনের ধারে গিয়ে যেমন দেবদত্ত পাল্‌কী থেকে মাটিতে নেমেছে, অমনি সেখানকার মাটি ফেটে দু'ফাঁক্ হ'য়ে গিয়ে তার ভিতর থেকে লক্ লকে আগুনের জিব্ বেরিয়ে দেবদত্তকে জীবন্ত পোড়াতে পোড়াতে পাতালের মধ্যে টেনে নিয়ে গেলো।

অজাতশত্রু যখন দেবদত্তের এই ভীষণ পরিণামের কথা শুনলে, তখন নিজকৃত পাপের ও পিতৃহত্যার অনুশোচনায় তার হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে উঠলো! তার মনে দুশ্চিন্তা, অশান্তি ও ভয় দেখা দিলে। অজাতশত্রু কেবলই এই বিভীষিকা দেখ্‌তে লাগ্‌লো যে, এখনি বুঝি পৃথিবী দ্বিধা হ'য়ে অগ্নি-জিহ্বা প্রসারিত ক'রে তাকে গ্রাস ক'রবে! দিনরাত একটা আশঙ্কা উদ্বেগে

সে যেন অস্থির হ'য়ে থাকতো। শরীরও তার দিন দিন ভেঙ্গে পড়তে লাগ্‌লো। রাজ্য, সম্পদ, গৃহ কিছুতে যেন আর তার সুখ নেই!

অবশেষে অস্থির হ'য়ে উঠে অজাতশত্রু মনে মনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা ক'রলে যে, যেমন ক'রেই হো'ক্ সে তথাগত বুদ্ধের শরণাপন্ন হবে, তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে এবং অবশিষ্ট জীবন তাঁরই শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে তাঁরই উপদেশ অনুসারে সে চ'লবে।

কিন্তু, নিজের গুরুতর মহাপাপ সব স্মরণ ক'রে সে কিছুতেই বুদ্ধদেবের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারলে না। তার পার্শ্বচরেরা সবাই তখন প্রায় বৌদ্ধ-বিদ্বেষী। একমাত্র মহা-অমাত্য জীবক ছিলেন তথাগতের চরণস্পর্শের সৌভাগ্যে ভাগ্যবান্। অজাতশত্রু একথা জানতেন, তিনি ঠিক ক'রলেন যে এই মন্ত্রী জীবকের সঙ্গে গিয়েই প্রভু বুদ্ধের পাদ-বন্দনা ক'রে আসবেন।

কিন্তু, জীবককে সে কথা ব'লতে তাঁর লজ্জা হ'তে লাগ্‌লো। অবশেষে তিনি মনে মনে এক উপায় স্থির ক'রে—কার্তিকোৎসবের সময় পূর্ণিমা রাত্রে সভাসদ্‌দের ডেকে ব'ললেন যে, "আজ আমার কোনো সাধু

পুরুষকে অর্চ্চনা করবার ইচ্ছে হ'য়েছে। কার কাছে গেলে সুখী হবো তোমরা বলো তো।"

অজাতশত্রুর কথা শুনে সভাসদেরা সবাই যে যার গুরুদেবের নাম ক'রতে সুরু করলে। কিন্তু মন্ত্রী জীবক চুপটি ক'রে সভার এক কোণে দাঁড়িয়েছিলেন। অজাতশত্রু তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"কই জীবক! তুমি তো কারুর নাম ক'রলে না।"

জীবক তখন অজাতশত্রুকে শ্রীভগবান্ তথাগত বুদ্ধের শরণ নেবার জন্য উপদেশ দিলেন। অজাতশত্রুও এই কথাটুকুই শোনবার জন্য অপেক্ষা ক'রছিলেন। তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন—"হস্তী-যান সুসজ্জিত ক'রে নিয়ে এসো।" অবিলম্বে হাতী প্রস্তুত হয়ে এলো।

অজাতশত্রু মগধের রাজার মতোই উপযুক্ত সমারোহে ও রাজোচিত আড়ম্বরের সঙ্গে শ্রীভগবানের চরণ-বন্দনা ক'রতে চ'ললেন। তথাগত তখন তাঁর একান্ত ভক্ত জীবকের আম্র-কাননেই সশিষ্য বিরাজ ক'রছিলেন। অজাতশত্রু গিয়ে তাঁর পায়ে মাথা লুটিয়ে প্রণাম ক'রে কৃতাঞ্জলিপুটে বুদ্ধদেবের স্তবগান ক'রলেন এবং বৌদ্ধসঙ্ঘের জয়গান ক'রলেন।

বুদ্ধদেব প্রীত হ'য়ে তাকে ক্ষমা ক'রলেন।

সেইদিন থেকে অজাতশত্রু তার সমস্ত অন্যায় ছেড়ে প্রভু বুদ্ধের একজন প্রকৃত ভক্ত হ'য়ে উঠলো। তথাগতের পরামর্শ ও অনুমতি না-নিয়ে সে আর কোনও কাজ ক'রতো না।

কিন্তু, ঠিক এই ঘটনার কিছুদিন পরেই ভগবান্ বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ ক'রলেন। অজাতশত্রু তাঁর শোকে একেবারে অভিভূত হ'য়ে প'ড়লো। তারপর স্বয়ং লোকজন নিয়ে কুশীনগরে গিয়ে প্রভু বুদ্ধের অস্থি সংগ্রহ ক'রে এনে রাজগৃহে তার উপর এক প্রকাণ্ড স্তূপ নির্ম্মাণ ক'রে রাখ্‌লে। সেদিন থেকে রাজগৃহ বৌদ্ধদের তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে।

(গৌতমের বালক-শ্রেষ্ঠী জন্ম)

অনেক কাল আগে 'বারাণসী' নামেই কাশী শহর বিখ্যাত ছিল।

বড় বড় বণিকদের তখন শ্রেষ্ঠী বলা হ'তো। সব চেয়ে বড় বণিক, তাকে লোকে ব'লতো—মহাশ্রেষ্ঠী।

দু'হাজার বছরের আগে বারাণসীতে যিনি মহাশ্রেষ্ঠী ছিলেন, তিনি খুব ভালো জ্যোতিষ জানতেন। কার কিসে ভালো হবে, মন্দ হবে, তিনি গুণে ব'লে দিতে পারতেন।

কাজেই, অনেক লোকে তাঁকে ভাগ্যগণনার জন্য বিরক্ত ক'রতো। একদিন তিনি ব্যস্ত হ'য়ে একটা বিশেষ কাজে রাজবাড়ীতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পথে দু'তিনটি ছেলে এসে তাঁকে ধ'রলে যে—"কিসে আমাদের অবস্থার উন্নতি হবে ব'লে দিন।"

রাস্তায় একটা মরা-ইঁদুর প'ড়েছিল। মহাশ্রেষ্ঠী সেই ইঁদুরটাকে দেখিয়ে দিয়ে ব'ললেন—"তোমাদের

মধ্যে যে এই মরা-ইঁদুরটি যত্ন ক'রে বাড়ী নিয়ে যাবে, সেই উন্নতি লাভ ক'রতে পারবে।"

তারা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে বলাবলি ক'রলে যে, নিশ্চয়—মহাশ্রেষ্ঠী তাদের উপহাস ক'রে গেলেন। মরা-ইঁদুর ঘরে নিয়ে গেলে ত ব্যায়রাম হবে!—এই ভেবে তারা হতাশ হ'য়ে যে যার বাড়ী চলে গেল। তাদের মধ্যে একটি ছেলে ছিল বড্ড গরীব। সে ভাবলে যে, মহাশ্রেষ্ঠী এত বড় একজন লোক হ'য়ে কি আর আমাদের সঙ্গে তামাসা ক'রতে পারেন। দেখাই যাক্ না এই মরা-ইঁদুরটি ঘরে তুলে নিয়ে গেলে আমার কপাল ফেরে কিনা? এই ভেবে সে অতি সযত্নে মরা-ইঁদুরটির ল্যাজ ধ'রে বাড়ী নিয়ে চললো।

পথের মাঝে একজন লোক তাকে ধ'রে ব'ললে, "মশাই আপনি ত' ওই মরা ইঁদুরটা ফেলে দিতে যাচ্চেন?—তার চেয়ে ওটা আমাকে দিন না। আমার পোষা বিড়ালটা আজ তিন দিন ইঁদুর খেতে পায় নি! তাকে দেবো।"

গরীবের ছেলেটি ইঁদুর দিতে চাইলে না। তখন লোকটি কিছু পয়সা দিয়ে তার কাছে থেকে মরা-ইঁদুরটি কিনে নিলে।

ছেলেটি সেই পয়সায় একটি কলসী ও কিছু গুড় কিনে ফুলবাগানের পথে গিয়ে বসলো। কলসীটি সে ঠাণ্ডা জলে ভরে রাখলে। বাগানে বাগানে ঘুরে ঘুরে মালী আর মালিনীরা ফুল তুলে ক্লান্ত হ'য়ে যখন ফিরছে—ছেলেটি তাদের ডেকে একটু একটু গুড় এক ভাঁড় করে তৃষ্ণার জল দিয়ে তাদের পরিতৃপ্ত ক'রলে। তারা ছেলেটির উপর খুসী হ'য়ে সবাই তাকে অনেক ভালো ভালো ফুল দিয়ে গেলো।

সেদিন হঠাৎ এক শ্রেষ্ঠির মেয়ের বিয়ে ঠিক হওয়ায় বাজারে তারা ফুল কিনতে এসেছিল, কিন্তু ভালো ফুল কারুর কাছেই পাচ্ছিল' না। এমন সময় দেখলে যে সেই ছেলেটি অনেক ভালো ফুল নিয়ে যাচ্ছে। তারা অমনি তাকে ডেকে নগদ কিছু টাকা দিয়ে তার কাছ থেকে সমস্ত ফুল কিনে নিয়ে গেলো।

তারপর, একদিন রাত্রে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হ'য়ে গেলো। রাজার বাগানে বিস্তর বড় বড় গাছের শুকনো ডাল পালা ভেঙ্গে পড়লো।

মালীরা ভাবছে কি ক'রে এই জঞ্জাল সাফ্ করি! ছেলেটি তাদের কাছে গিয়ে ব'ললে—আমি এখনি সব সাফ্ করিয়ে দিতে পারি যদি ওই শুকনো কাঠগুলি

আমাকে নিয়ে যেতে দাও। মালীরা তৎক্ষণাৎ এ কথায় রাজী হ'লো। ছেলেটি তখন পাড়ার সমস্ত ছেলেকে মিষ্টান্ন দিয়ে ভুলিয়ে 'রাজার বাগানে কাঠ-কুড়ানো খেলিগে চল্' বলে ডেকে নিয়ে গেলো।

খেলার আমোদে মেতে ছেলের দল স্ফূর্ত্তি করে রাজার বাগানের সমস্ত ডালপালা শুকনো কাঠ একেবারে সাফ্ করে তুলে নিয়ে এলো সেই ছেলেটির ঘরে।

সেদিন একজনের কর্ম্ম-বাড়ীতে রান্নার কাঠ কম পড়েছিল। তারা কাঠ খুঁজতে বেরিয়ে সেই ছেলেটির রাজ-বাগান থেকে কুড়িয়ে-আনা কাঠগুলি অনেক টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে গেলো।

এমনি করে ছেলেটির হাতে ক্রমে ক্রমে পঞ্চাশ টাকা হ'লো। একদিন সে শুনলে যে বিদেশ থেকে একজন অশ্ববণিক পাঁচশ' ঘোড়া নিয়ে এই সহরেই বেচ্‌তে আসছে। ছেলেটি শুনেই শহরের যত ঘেসেড়া ছিল তাদের সমস্ত ঘাস নিজে কিনে নিলে। ঘোড়াওয়ালা এসে শহরের কোথাও আর ঘাস না পেয়ে, শেষে সেই ছেলেটির কাছ থেকেই ডবল দাম দিয়ে সমস্ত ঘাস কিনে নিয়ে গেলো।

এমনি করে ক্রমে তার হাতে যখন প্রায় একশ'

টাকা জমে গেলো—তখন, একদিন সে খবর পেলে যে বন্দরে এইবার দেশবিদেশ থেকে অনেক দরকারী জিনিস বোঝাই নিয়ে একখানি প্রকাণ্ড অর্ণবপোত আসছে। সে রোজ বন্দরে গিয়ে সেই জাহাজখানি আসবার অপেক্ষা ক'রতে লাগ্‌লো। একদিন দূর থেকে দেখতে পেলে যে জাহাজ আসছে। সে তখনি একখানি নৌকা ভাড়া ক'রে বন্দরে ভেড়বার অনেক আগেই সেই জাহাজে গিয়ে উঠলো এবং জাহাজের মালিকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে নগদ একশ' টাকা তাকে বায়না দিয়ে জাহাজের সমস্ত মাল অগ্রিম কিনে নিলে।

এদিকে শহর-শুদ্ধ বণিক গিয়ে বন্দরে দাঁড়িয়ে আছে সেই সকাল থেকে। জাহাজ এসে তীরে লাগলে মাল কিনবে ব'লে।

অর্ণবপোত এসে বন্দরে লাগ্‌লো। তারা সব ভীড় করে মাল কিনতে গিয়ে শুনলে সমস্ত মাল বন্দরে ঢোকাবার আগেই একজন বালক শ্রেষ্ঠী কিনে নিয়েছে।

কে সে বালক—বণিকরা সকলেই তার খোঁজ করতে লাগলো।

ছেলেটি এদিকে অনেক আগেই নৌকো করে ফিরে এসে বন্দরে এক মস্ত তাঁবু খাটিয়ে জাঁকিয়ে বসেছিল।

তিনচার জন প্রতিহারী বাহাল ক'রে তাদের শিখিয়ে দিয়েছিল যে যদি কোনও বণিক আমাকে খোঁজে, তোমরা তাঁকে খাতির করে একজন আর একজনের কাছে পৌঁছে দেবে, সে আবার আর একজনের কাছে পৌঁছে দেবে। এমনি ক'রে চার দ্বারপালের হাত ঘুরিয়ে যেন তাকে আমার কাছে আনা হয়।

বণিকেরা জাহাজের মাল কেনবার জন্য সন্ধানে এসে এই সব কায়দা কানুন দেখে ভড়্‌কে গেল! এই বালক শ্রেষ্ঠী নিশ্চয় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী এই মনে ক'রে তারা জাহাজের মাল পাবার জন্য কাতর মিনতি জানিয়ে তাকে দ্বিগুণ লাভ দিতে স্বীকার হ'লো।

ছেলেটি তখন নগদ দু'লক্ষ টাকা লাভে জাহাজের সমস্ত মাল তাদের বেচে খুশী হ'য়ে বাড়ী ফিরে এলো এবং সেই যে মহাশ্রেষ্ঠী যিনি তাকে ইঁদুরটা তুলে নিয়ে যেতে ব'লেছিলেন, তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে নিজের অসীম কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ব'ললে—আপনার অনুগ্রহেই আমার এই সম্পদ লাভ হ'লো। অতএব আমি আমার গুরু-দক্ষিণা স্বরূপ এই লক্ষমুদ্রা আপনার চরণে প্রণামী দিতে চাই।

মহাশ্রেষ্ঠী সমস্ত শুনে বুঝতে পারলেন যে এই

ছেলেটির বাণিজ্য-বুদ্ধি ও অধ্যবসায় অসাধারণ। তিনি তাঁর একমাত্র পরমা সুন্দরী মেয়ের জন্য এই রকম একটি উপযুক্ত পাত্রই খোঁজ করছিলেন। এই ছেলেটিকে পেয়ে তিনি যেন নিশ্চিন্ত হ'লেন। তাঁর পুত্র ছিল না। মহাশ্রেষ্ঠীর অগাধ সম্পত্তি এবং সপ্তসাগরে বাণিজ্য। এই ছেলেটি তাঁর সেই সম্পত্তি রক্ষা করতে এবং তাঁর বাণিজ্য চালাতে পারবে জেনে তিনি তাঁর একমাত্র কন্যার সঙ্গে ছেলেটির বিবাহ দিলেন।

কিছুদিন পরে মহাশ্রেষ্ঠীর মৃত্যু হ'ল। তখন সেই ছেলেটিই তাঁর অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'য়ে বারাণসীর মহাশ্রেষ্ঠীর পদ লাভ করলে।

(গৌতমের ব্রাহ্মণ-সাধু জন্ম)

১

কাশীর এক রাজার ছেলের নাম ছিল দুষ্টকুমার। ছেলেবেলা থেকেই সে ভয়ানক দুরন্ত ছিল ব'লে রাজা তার নাম রেখেছিলেন—দুষ্টকুমার।

দুষ্টকুমার যত বড় হ'তে লাগ্‌লো ততই তার দুষ্টামী বাড়তে লাগ্‌লো। ক্রমে সে এমন নিষ্ঠুর আর অত্যাচারী হ'য়ে উঠলো যে রাজ্যশুদ্ধ লোক তাকে ভয় ক'রতে ও ঘৃণা ক'রতে সুরু ক'রলে।

দুষ্টকুমার যুবরাজ হ'য়ে উঠবার কিছুকাল পরে অনেক লোকজন সঙ্গে নিয়ে একদিন নদীতে গেলেন "জলক্রীড়া" করবার জন্য। যুবরাজের খেলা-ধূলাও ছিল লোকের উপর শুধু উৎপীড়ন, আর অত্যাচার করা। কাউকে থামে বেঁধে ক্রমাগত নির্দ্দয় প্রহার ক'রে—

কাউকে উঁচু গাছের উপর থেকে কিম্বা পাহাড়ের উপর থেকে নীচেয় ফেলে দিয়ে—কাউকে জলে ডুবিয়ে মেরে—কাউকে আগুনে পুড়িয়ে তিনি নিষ্ঠুর আমোদ পেতেন। সেই জন্যে বেশীর ভাগ লোকই তাঁকে মনে করতো রাক্ষস-রাজপুত্র।

নদীর জলে দুষ্টকুমার যেদিন খেলতে গেলেন তাঁর সঙ্গের লোকজনেরা সব ভয়ে ভগবানের নাম জপ করতে লাগ্‌লো। সকলেরই মনে ভাবনা হলো—না জানি আজ কার অদৃষ্টে কি আছে? কে মরবে—কে বাঁচবে—কে ব'লতে পারে!—রাক্ষস-রাজপুত্রের হাত থেকে প্রাণ নিয়ে অক্ষত শরীরে যে সবাই ঘরে ফিরতে পারবে না—এ তারা নিশ্চিত জানতো! সবাই তাই ভয়ে মুখ শুকিয়ে ভাবছিল—আজ বোধ হয় তারই পালা!—কে জানে?—

কিন্তু সকলকে নির্ভয় ক'রে দিয়ে সেদিন হঠাৎ তুমুল ঝড় বৃষ্টি সুরু হ'লো এবং নদীতে এমন জোর তুফান উঠলো যে রাজপুত্র দুষ্টকুমার আর তীরে উঠে আসতে পারলেন না—নদীর স্রোতের বেগে কোথায় ভেসে চ'লে গেলেন। তাঁর সঙ্গের লোকজনেরা কেউই তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করলে না। তারা ভাবলে যে

এই দুর্ঘটনায় যদি দুষ্ট নিপাত হ'য়ে যায় তাহ'লে সকলেরই মঙ্গল।

নদীতে বাণ ডেকেছে দেখে প্রাণ ভয়ে লোকজনেরা সব রাজধানীতে পালিয়ে এলো। রাজা তাদের কুমারের কথা জিজ্ঞাসা ক'রতেই, সকলে মিলে ব'ললে—"তিনি তো আকাশে মেঘ ক'রে ঝড় উঠ্‌তে দেখেই সকলের আগে ফিরে এসেছেন।"

তখন চারিদিকে কুমারের খোঁজ পড়ে গেলো। কিন্তু দুষ্টকুমারকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না! তখনো ভীষণ ঝড় বইছে, আর মূষল ধারায় বৃষ্টি প'ড়ছে! এদিকে নদীতে বাণ ডেকে শহরের ভিতরেও জলপ্লাবন উপস্থিত হ'য়েছে।

নদীর প্রবল স্রোতে একগাছি খড়ের মতো দুষ্ট-কুমার কোথায় যে ভেসে চলেছিল তার ঠিক নেই। প্রাণ ভয়ে সে কেবল—"রক্ষা করো!" "রক্ষা করো!" "কে আছো—আমাকে বাঁচাও!"—বলে চীৎকার ক'রছিল। সেই সময় নদীর স্রোতে একটি গাছের গুঁড়ি ভেসে যাচ্ছিল। সেই গাছের গুঁড়িতে, বাণের জলে গর্ত্ত ভেসে যাওয়াতে একটি সাপ আর একটি ইঁদুর উঠে আশ্রয় নিয়েছিল। তারা রাজপুত্রের দুর্দ্দশা

দেখে তাকে ডেকে ব'ললে "তুমিও এসো—আমাদের সঙ্গে এই গাছের গুঁড়ি ধ'রে আশ্রয় নাও!" রাজপুত্র যেন বেঁচে গেলো এমনই একটা আরাম বোধ করতে লাগ্‌লো—সেই জলে ভেসে-আসা গাছের গুঁড়িটি আশ্রয় ক'রে।

এই সময় ঝড়ের বেগে নদীতীরের গাছ ভেঙে পড়াতে বাসা হারিয়ে বৃষ্টির জলের ছাটে ছিট্‌কে একটা শুকপাখীও এসে তাদের সঙ্গে সেই গাছের গুঁড়িটিতে আশ্রয় নিয়ে—বাণের জলে ভাসতে লাগ্‌লো!

এমনি ক'রে তারা চার টি প্রাণী—একটি মানুষ, একটি সাপ, একটি ইঁদুর, আর একটি পাখী সেই দারুণ দুর্যোগে একটি গাছের গুঁড়িকে আশ্রয় ক'রে দু'তিন দিন ধ'রে জলে ভাস্‌লে। এ কয়দিন কিছু খেতে না পেয়ে সবাই তারা ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়েছিল। খাবেই বা কি? চারিদিকে শুধু জল—জল—আর জল!

রাজপুত্রের বড্ড ভয় হ'তে লাগ্‌লো! এমনি ক'রে অনাহারে তিলে তিলে হয়ত তাকে মরতেই হবে, হয়ত এ যাত্রা আর তার উদ্ধার নেই ভেবে সে আতঙ্কে শিউরে উঠলো, এবং কাতর ভাবে আবার আর্ত্তনাদ

সুরু ক'রলে—"ওগো কে কোথায় আছো ? রক্ষা করো !—আমাকে বাঁচাও !"

সেই নদীর তীরে বাঁকের মুখে একজন বামুনের ছেলে সংসার ছেড়ে এসে সাধু হ'য়ে একখানি পর্ণ-কুটির বেঁধে বাস ক'রছিলেন। রাজপুত্র দুষ্টকুমারের করুণ চীৎকার তাঁর কাণে এসে পৌঁছতেই, তিনি আর থাকতে পারলেন না। তাঁর কোমল হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হ'লো। তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবানের নাম নিয়ে সেই বাণের জলে ফুলে-ওঠা প্রচণ্ড বেগবতী নদীতেই ঝাঁপ দিয়ে প'ড়লেন। তাঁর গায়ে হাতীর মতো জোর ছিল। তিনি সাঁতার কেটে গিয়ে সেই গাছের গুঁড়িটীকে মাঝ-নদী থেকে টেনে ডাঙায় তুলে নিয়ে এলেন।

শ্রান্ত ক্লান্ত উপবাসী রাজকুমারের সঙ্গে তিনি সেই সাপটিকে, ইঁদুরটিকে এবং শুকপাখীটিকেও বহু যত্নে নিজের কুটিরে নিয়ে গিয়ে আগুন তাপ দিয়ে সেবা শুশ্রূষায় সুস্থ ক'রে তুললেন। তারপর তাদের সকলেরই খাবার ব্যবস্থা ক'রলেন।

রাজপুত্র দুষ্টকুমার বরাবর লক্ষ্য ক'রছিল যে তাদের এই আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণটি সর্ব্বাগ্রে তার সেবা
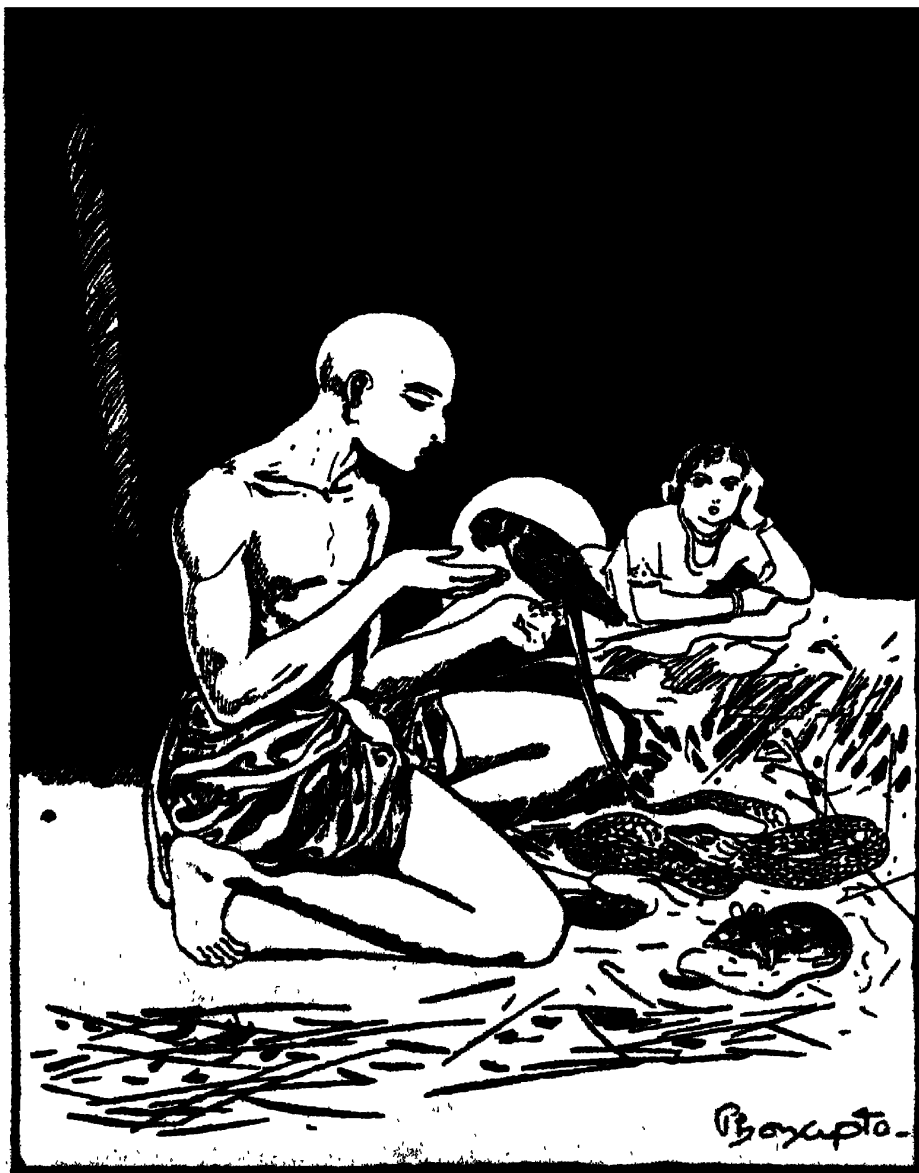
শুশ্রূষার ব্যবস্থা না ক'রে—ওই নোংরা জানোয়ার গুলোরই সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা আগে ক'রলে। তারপর খাবার সময়ও যখন সে দেখলে যে আগে সাপ তারপর ইঁদুর তারপর শুকপাখীর খাওয়া শেষ হ'তে তবে তার আহারের ব্যবস্থা হ'লো ; তখন সে ঐ ব্রাহ্মণের উপর মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো ! কতকগুলো ইতর প্রাণীর কাছে রাজপুত্রের অপমান ! এ দুষ্টকুমারের কিছুতেই সহ্য হ'লো না। সে তৎক্ষণাৎ দৃঢ়সঙ্কল্প কর'লে যে—যদি কখনো একে আমার রাজধানীর মধ্যে পাই, তাহলে এর এই উদ্ধত অভদ্রতার জন্য সমুচিত শাস্তি বিধান করবো নিশ্চয়।

অল্পদিনের মধ্যেই আকাশ বেশ পরিষ্কার হ'য়ে গেলো এবং বন্যার জলও চলে গিয়ে মাঠ ঘাটের পথ বেশ পরিষ্কার হ'য়ে শুকিয়ে উঠ্‌লো।

সাপ, ইঁদুর, শুক ও যুবরাজ চারজনেই ব্রাহ্মণের সেবা যত্নে এর মধ্যে বেশ সুস্থ ও সবল হ'য়ে উঠেছিল। তাঁরা এইবার ব্রাহ্মণের কাছে বিদায় নিয়ে একে একে যে যার বাসায় ফিরে গেলো। যাবার সময় ব্রাহ্মণের পায়ে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম ক'রে সাপ ব'লে গেলো—"প্রভু ! আমি পূর্ব্ব জন্মে একজন কোটীপতি

বণিক ছিলুম ! টাকার মায়া কিছুতে ভুলতে পারিনি। নদীর নির্জ্জন তীরে আমি চল্লিশ কোটী স্বর্ণমুদ্রা পুঁতে রেখেছিলুম। তাই মৃত্যুর পর সর্পজন্ম লাভ ক'রে সেইখানেই একটি গর্ত্তের মধ্যে বাস ক'রছি এবং আমার টাকা আগলাচ্ছি। কিন্তু, আপনি দুঃসময়ে আমার যে উপকার ক'রেছেন, তাতে আমি ওই চল্লিশ-কোটী স্বর্ণমুদ্রা আপনাকেই দিয়ে যেতে চাই। আপনার যখনই প্রয়োজন হবে আমাকে জানাবেন।"

ইঁদুর ব'লে গেলো—"প্রভু ! আমিও নিতান্ত গরীব নই। আমারও এককালে ধনী বণিক ব'লে খ্যাতি ছিল ! ওই টাকার মায়া কাটাতে পারিনি ব'লেই—ম'রে গিয়ে ইঁদুর হ'য়ে নদীর ধারে যেখানে আমার তিরিশ কোটী স্বর্ণমুদ্রা পোঁতা ছিল—সেইখানে গর্ত্ত ক'রে বাস ক'রছি ! আপনি যখনই কিছু প্রয়োজন মনে ক'রবেন—একবার গিয়ে শুধু 'ইঁদুর !' বলে' ডাকলেই তৎক্ষণাৎ আমি বেরিয়ে এসে সেই তিরিশ কোটী স্বর্ণমুদ্রা আপনাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবো।"

শুক যাবার সময় ব'লে গেলো—"প্রভু! আমি দরিদ্র বটে, কিন্তু, সমস্ত শুক আমাকে তাদের প্রধান ব'লে মানে ; যদি আদেশ করেন, তাহ'লে আমার সমস্ত শুক

পাখীর ঝাঁক নিয়ে গিয়ে সকল দেশ দেশান্তরের শস্য ও তণ্ডুলকণা অর্থাৎ ধান চাল সবই আপনার পায়ের কাছে এনে জড়ো ক'রে রাখতে পারি !”

ব্রাহ্মণ হাসিমুখে সকলকে আশীর্ব্বাদ ক'রে তাদের মঙ্গল কামনা ক'রে বিদায় দিলেন ও ব'ললেন, “বন্ধুগণ! তোমাদের এই প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি আমার মনে থাকবে। যখন প্রয়োজন হবে তোমাদের কাছে নিশ্চয় যাবো। আজ আমার কিছুই দরকার নেই।”

যুবরাজ দুষ্টকুমার তাদের দেখা-দেখি যাবার সময় বিশেষ করে ব্রাহ্মণকে ব'লে গেলো যে—“আমি রাজা হ'য়ে সিংহাসনে ব'সলে আপনি দয়া করে একবার অতি অবশ্য আমার রাজধানীতে পায়ের ধূলো দেবেন। দেখবেন, আমি আপনার কী রকম আদর অভ্যর্থনা করি। আমার রাজভণ্ডার আমি মুক্ত ক'রে দেবো আপনার পায়ে !” মনে মনে ব'ললে—“একবার এলে হয় ! এমন মজা দেখাবো যে-টেরটি পাবেন !”

২

তারপর বহুকাল কেটে গেছে। ব্রাহ্মণ তাদের কথা প্রায় ভুলেই গেছলেন ! হঠাৎ একদিন একটি ইঁদুর দেখতে পেয়ে তাঁর মনে হ'লো—'তাইত ! আমার সে

বন্ধুদের একবার খবর নিলে ত' মন্দ হয় না!—দেখাই যাকনা—তারা সবাই তাদের কথা রাখতে পারে কিনা?'

যেমনি মনে হওয়া—অমনি বেরিয়ে পড়া! খুঁজে খুঁজে ব্রাহ্মণ নদীর ধারে সাপের গর্ত্তের কাছে গিয়ে একবার ডাকতেই সাপ তখনি আনন্দে ফণা তুলে নাচতে নাচতে ছুটে বেরিয়ে এলো এবং ব্রাহ্মণের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে প্রণাম ক'রে বল্লে—"নিয়ে যান দেবতা! এইখানে আমার চল্লিশ কোটী স্বর্ণ মুদ্রা এই মাটির মধ্যে লুকানো রয়েছে! এ সমস্তই আপনার!"

ব্রাহ্মণ খুসী হয়ে ব'ললেন—"উত্তম! বন্ধু, এখন ও টাকা তোমার কাছেই থাক্, প্রয়োজন হ'লে আমি এসে নিয়ে যাবো।"

তারপর তিনি ইঁদুরের কাছে গেলেন। গর্ত্তের ধারে গিয়ে ডাকবামাত্র ইঁদুর আনন্দে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে এলো। ব্রাহ্মণের পায়ে প্রণাম জানিয়ে ব'ললে—"প্রভু! এইখানে মাটির মধ্যে আমার তিরিশ কোটী টাকা রয়েছে। আপনি এখনি নিয়ে যান্।"

ব্রাহ্মণ প্রীত হ'য়ে ইঁদুরকে আশীর্ব্বাদ ক'রে ব'ললেন—"বড় খুসী হলুম বন্ধু, তোমার কথা শুনে।

ও টাকা এখন তোমার কাছেই থাক। আবশ্যক হ'লে আমি এসে নিয়ে যাবো।”

তারপর ব্রাহ্মণ গেলেন শুকপাখীর সন্ধানে। গাছ্‌ তলায় গিয়ে ডাক দিতেই বাসার ভিতর থেকে ঝট্‌পট্‌ ক'রে ডানা ঝেড়ে বেরিয়ে এসে শুক ব্রাহ্মণের চরণ-বন্দনা ক'রলে এবং তাঁকে জানালে যে আদেশ পেলে এখনি সে তার দলবল নিয়ে শস্য সংগ্রহ করতে বেরিয়ে প'ড়বে।

ব্রাহ্মণ আনন্দিত হ'য়ে ব'ললেন—“তোমার ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলুম বন্ধু! যখন দরকার হবে আমি তোমাকে জানাবো। এখন বাসায় গিয়ে তুমি আরামে থাকো।”

এই বলে তিনি শুকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজপুত্র দুষ্টকুমারের সঙ্গে দেখা ক'রতে গেলেন। দুষ্টকুমার তখন আর যুবরাজ নন। পিতার মৃত্যুর পর তিনিই কাশীর রাজা হ'য়ে সিংহাসনে বসেছেন। তাঁর নিত্য নূতন নূতন অত্যাচারে কাশীবাসী প্রজারা সকলে উত্যক্ত হ'য়ে উঠেছিল।

এমন সময় ব্রাহ্মণ গিয়ে রাজধানীতে প্রবেশ ক'রলেন। মহারাজ দুষ্টকুমার তখন একটি সুসজ্জিত হাতীর পিঠে চড়ে বহু অনুচরবর্গ সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে

বেরিয়েছিলেন। দূর থেকে তিনি ব্রাহ্মণকে দেখেই চিনতে পারলেন। তাঁর সেই রাত্রের নিদারুণ অপমানের কথা মনে পড়ে গেলো! ব্রাহ্মণের সেই—তাঁকে অবহেলা ক'রে সাপকে, ইঁদুরকে আগে খেতে দেওয়া!—তাঁর সেবা-শুশ্রূষা সর্ব্বাগ্রে না ক'রে একটা শুকপাখীকে আগে যত্ন ক'রে সুস্থ করা!—দুষ্টকুমার স্থির ক'রলে—ব্রাহ্মণের সেই অন্যায় স্পর্দ্ধার খুব কঠিন দণ্ড দিতে হবে আজ। এইবার তার উত্তম সুযোগ পাওয়া গেছে। তৎক্ষণাৎ দুষ্টকুমার তাঁর অনুচরদের ডেকে আদেশ দিলেন যে—"এখনি ওই ব্রাহ্মণকে ধ'রে হাত-পা বেঁধে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে—বেত মার্‌তে মার্‌তে শহরের বাইরে টেনে নিয়ে যাও, এবং মশানে ওর মুণ্ডুটা কেটে ধড়টা শূলে চাপিয়ে দাও গে! খবর্‌দার্! ও যেন পালাতে না পারে, কিম্বা আমার কাছে না আসতে পারে! তার আগেই বধ করা চাই!"

রাজার হুকুম পেয়ে নিষ্ঠুর অনুচরেরা ছুটে গিয়ে ব্রাহ্মণকে পিছ্‌মোড়া করে বেঁধে রাস্তার প্রত্যেক চৌমাথায় নির্দ্দয়ভাবে চাবুক মারতে মারতে মশানের দিকে টেনে নিয়ে চললো!

ব্রাহ্মণের মুখ দিয়ে কিন্তু একবারও যন্ত্রণায়—

আঃ! উঃ! বা, গেলুম! মলুম!—ইত্যাদি কোনো রকম কাতর চীৎকারই শোনা গেলনা। তিনি যতই মার খাচ্ছেন ততই শুধু একটি শ্লোক ব'লছেন, শুনে তাঁর চার পাশে হাজার হাজার লোক জড় হয়ে গেল! রাজ অনুচরেরা তখন আরও জোরে তাঁকে মারতে সুরু করে দিলে। কিন্তু, ব্রাহ্মণের তাতে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁর মুখে সেই এক শ্লোক—

"বানের জলে মানুষ যদি
　　　　ভাস্‌ছে দেখো কাঠের 'পরে,
মানুষ ফেলে আনবে তুলে
　　　　কাঠ্‌টা শুধু আপন ঘরে!—
এই যে কথা,—আজকে আমি
　　　　বুঝ্‌চি মনে মিথ্যা নয়;
কাঠ্‌টা লাগে অনেক কাজে;
　　　　—মানুষ শুধু শত্রু হয়!"

ব্রাহ্মণের মুখের এই শ্লোক শুনে বুদ্ধিমান লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"আমাদের রাজার কি আপনি কখনো কিছু ভালো করেছিলেন?"

ব্রাহ্মণ তখন সেই ভিড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, বানের জল থেকে দুষ্টকুমারকে উদ্ধার করা ও সেবা-শুশ্রূষার

দ্বারা তার প্রাণ বাঁচিয়ে তাকে সুস্থ ক'রে দেশে পাঠানোর কথা সমস্তই বর্ণনা ক'রলেন।

ব্রাহ্মণের কাছে এই সব কথা শুনে নগরবাসীরা সকলে পাপিষ্ঠ রাজার বিরুদ্ধে একেবারে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলো!—"যে দেশে এমন নরাধম রাজা থাকে সে দেশের সর্ব্বনাশ হয়ে যায়!"—এই বলে তারা রাজাকে তৎক্ষণাৎ মেরে ফেলবার জন্য যে-যার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছুটলো।

রাজা দুষ্টকুমার তখনো নগর প্রদক্ষিণ ক'রে প্রাসাদে ফিরতে পারেন নি। উত্তেজিত প্রজার দল—ছুটে গিয়ে তাঁকে পথেই আক্রমণ ক'রে মেরে ফেললে, এবং রাজার মৃতদেহের পা ধরে টানতে টানতে আবর্জ্জনার মতো সেটাকে রাস্তার ধারে খানার মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলে।

তারপর তারা সকলে সসম্মানে সেই ব্রাহ্মণকে নিয়ে গিয়ে তাদের রাজসিংহাসনে বসিয়ে দিলে।

ব্রাহ্মণ রাজা হ'য়ে দেশের দুঃখ দৈন্য দূর করবার জন্যে এবং রাজকোষের শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বন্ধু সেই সাপকে, ইঁদুরকে আর শুক পাখীকে বহু সমাদরে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসে রাখলেন। সাপের থাকবার জন্য তিনি একটি সোনার সুড়ঙ্গ তৈরী

ক'রে দিলেন। ইঁছুরের থাকবার জন্য তিনি একটি স্ফটিকের গর্ত্ত ক'রে দিলেন এবং শুকের থাকবার জন্য তিনি একটি সোনার খাঁচা গড়িয়ে দিলেন। সাপ আর ইঁছুরের কোটী কোটী স্বর্ণ মুদ্রায় রাজকোষ পূর্ণ হয়ে গেলো। শুকের দল বল গিয়ে যে প্রচুর শস্য সংগ্রহ করে নিয়ে এলো তাতে রাজ্যের ছুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেলো! রাজা তাই রোজ নিজের হাতে সোনার বাটী—সোনার থালা ক'রে—তাদের জন্যে সরু চালের ভাত, খাঁটি ছুধ, আর খই মধু নিয়ে গিয়ে তাঁর সেই বন্ধু ক'টিকে খাওয়াতে লাগ্‌লেন এবং সুখে স্বচ্ছন্দে রাজত্ব ক'রতে লাগ্‌লেন।

(গৌতমের 'বনের মেয়ের' গর্ভে জন্ম)

—এক—

অনেক কাল আগে, প্রায় দু'হাজার বছরের বেশী হবে, বারাণসীর এক রাজা ছিলেন, তাঁর নাম ব্রহ্মদত্ত।

একদিন মহারাজ রাজপ্রাসাদ ছেড়ে শহরের বাইরে তাঁর প্রমোদ-উদ্যানে বেড়াতে গেছ্‌লেন।

বাগানে নানারকম ফুলের গাছ, ফলের গাছ দেখে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ মহারাজ শুনতে পেলেন—কে যেন কোথায় খুব মিষ্টি গলায় গান গাইছে!

মহারাজ সেই গান শুনে উৎকর্ণ হ'য়ে কে তাঁর বাগানের কাছে এসে এমন চমৎকার গান গাইছে তাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন।

খুঁজতে খুঁজতে আমের বনে এসে তিনি দেখলেন

যে একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে আপন মনে গান গাইছে আর কাঠ কুড়ুচ্ছে।

মহারাজ তার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। তার কাছে গিয়ে আদর ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—তুমি কে গো ?

মেয়েটি রাজাকে দেখে একটুও ভয় পেলে না। সে ভারী সরল। রাজার মুখের দিকে চেয়ে হেসে জিজ্ঞাসা ক'রলে—তুমি কে গো ?

রাজা ব'ললেন—আমি যে এ দেশের রাজা গো ! আমায় তুমি চেনোনা ?

মেয়েটী তেমনই হাসি মুখে ব'ললে—আমি যে এ বনের রাণী গো ! আমায় তুমি চেনো না ?

মহারাজ সেই মেয়েটির হাসি দেখে খুসী হ'য়ে, তার কথা শুনে আনন্দিত হ'য়ে ব'ললেন—তুমি যদি রাণী—তবে আমাকে বিয়ে করো না।

মেয়েটি ব'ললে—রাণীকে বুঝি এমনি করে বিয়ে করে ? তুমি কী রকম রাজা ? হাতীতে চড়ে এসো, ঘোড়ায় চড়ে এসো, রথে চড়ে এসো, না হয় অন্ততঃ চতুর্দ্দোলায় চড়ে এসো, তবে তো রাজার সঙ্গে রাণীর বিয়ে হবে।

রাজা ব'ললেন—আমি ঘোড়ায় চ'ড়ে যেতে পারি। হাতী, রথ বা চতুর্দ্দোলা তো এখানে আনিনি!—তোমাদের বাড়ী কোথা রাণী?

মেয়েটি ব'ল্‌লে—বারে। তুমি আমায় ডাকছো কেন? আমি তো এখনও তোমার রাণী হইনি।

রাজা ব'ল্‌লেন—তবে তোমার নাম কি বলো? তোমাকে কী ব'লে ডাকবো?

মেয়েটি ব'ল্‌লে—আমাকে তুমি 'বনের মেয়ে' ব'লে ডেকো। আমাদের বাড়ী এই বনের ধারে। আমি রোজ এই বনে কাঠ কুড়োতে আসি। এখানে এলেই আমার সঙ্গে তোমার দেখা হবে।

তারপর সে রাজার মুখের দিকে তার বড় বড় ভোমরা-কালো চোখ দুটি মেলে অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখে ব'ল্‌লে—হ্যাঁগো—তুমি বুঝি সেই বিজন দেশের রাজপুত্তুর? পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চ'ড়ে, তেপান্তরের মাঠ পার হ'য়ে আমাকে কি বিয়ে ক'রতে এসেছো? ঠাকুরমার কাছে রোজ সন্ধ্যেবেলা আমি তোমাদের কত গল্প শুনি। তুমি চলো না আমার সঙ্গে আমার ঠাকুর-মার কাছে। ঠাকুরমা আমার 'বর' দেখবার জন্য রোজ কাঁদে।—আমাদের আর কেউ নেই কিনা।

ঠাকুরমা আমাকে বলে—'কুড়ুনি!' বলে—কুড়ুনি, তোকে আমি কার হাতে দিয়ে যাবো সেই ভাবনাতে আমার রাত্রে ঘুম হয় না!—আমি ঠাকুরমাকে বলি—'ঠাকুরমা, আমার জন্যেও রাজপুত্তুর আসবে, তুমি কিচ্ছু ভেবো না!' দেখো, আমার কথা আজ ঠিক মিলে গেলো! তুমি এখনি চলো ঠাকুরমার কাছে। আহা, ঠাকুরমার বড্ড দুঃখু। ঠাকুরমার ছেলে মরে গেছে, বউ মরে গেছে, মেয়ে মরে গেছে, ঠাকুরমারও একজন 'বর' ছিল সেও আর নেই! এখন কেবল আমি একলা আছি—

এই রকম কত কি কথা ব'লতে ব'লতে মেয়েটি তার কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে রাজার হাত ধ'রে তাদের বাড়ীতে টেনে নিয়ে চল্‌লো।

পথে যেতে যেতে রাজা ব'ললেন—বনের মেয়ে! তোমার মাথার কাঠের বোঝা তুমি আমার মাথায় তুলে দাও। তুমি আমার রাণী হবে। তোমাকে কি আমি কাঠ বইতে দিতে পারি!

মেয়েটি লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠে ব'ল্‌লে—তোমার যে কাঠ বইতে কষ্ট হবে রাজপুত্তুর। আমার রোজ রোজ নিয়ে গিয়ে অভ্যেস হ'য়ে গেছে। কিন্তু তুমি তো পারবে না রাজা!

রাজা ব'ল্‌লেন—তুমি যখন আমাকে 'রাণী' বল্‌তে দিলে না, তখন কেন তুমি আমাকে 'রাজা' বল্‌বে ?

মেয়েটি অপ্রস্তুত হ'য়ে ব'ল্‌লে—তবে কি ব'ল্‌বো তোমাকে ?—

রাজা ব'ল্‌লেন—কেন, 'বনের ছেলে' বলবে !

মেয়েটি সজোরে ঘাড় নেড়ে বল্‌লে—না, আমি 'রাজা' ব'লবো !

রাজা বল্‌লেন—তবে আমিও 'রাণী' বল্‌বো !

ঝগড়া মিটে গেল। দুজনে আবার ভাব হ'য়ে গেল।

রাজা মেয়েটির কাঠের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে তার হাত ধ'রে তাদের বাড়ী চল্‌লেন।

—দুই—

দেখতে দেখতে এক বৎসর কেটে গেল।

মহারাজ ব্রহ্মদত্ত সেই মেয়েটিকে বিয়ে ক'রে বেশ মনের আনন্দে তার সঙ্গে সেই বাগান-বাড়ীতে বাস ক'রছিলেন। হঠাৎ রাজধানী থেকে খবর এলো শত্রুরা রাজ্য আক্রমণ ক'রেছে! মহারাজকে এখনি ফিরতে হবে।

মহারাজ চ'লে আসবার আগে তাঁর হাতের মহামূল্য একটি আংটি মেয়েটিকে দিয়ে ব'ল্‌লেন,—ওগো আমার

বিজন দেশের রাণী ! আমি যুদ্ধ ক'রতে চল্লুম। যদি আর না-ফিরি তুমি এই আংটি বেচে তোমার কোলে যদি মেয়ে হয়, তাকে যৌতুক দিও ! আর যদি তোমার ছেলে হয়—তা হ'লে এই আংটি তার হাতে দিয়ে তাকে রাজধানীতে পাঠিও—তোমার ছেলেই আমার রাজ-মুকুট আর সিংহাসন পাবে !

রাজা চ'লে গেলেন। মেয়েটা রাজার জন্য ভেবে ভেবে বড্ড কাতর হ'য়ে পড়লো। ঠাকুরমা তাকে কিছুতে আর ভুলিয়ে রাখতে পারে না। এমন সময় তার কোলে একটি চাঁদের মতো ফুট্‌ফুটে ছেলে এলো !

মেয়েটি তার খোকাকে পেয়ে রাজার দুঃখ অনেকটা ভুলে রইলো।

ছেলে দিন দিন বড় হ'য়ে উঠলো। ক্রমে সে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশে খেলা-ধুলো ক'রতে শিখ্‌লে ! সব ছেলেদেরই 'বাবা' আছে—কেবল তারই 'বাবা' নেই ! ছেলেরা তাই তাকে 'নির্বাপ' ব'লে ঠাট্টা ক'রতে লাগলো। ছেলেটির তাতে মনে ভারী কষ্ট হ'তে লাগলো। সে একদিন তা'র মা'কে গিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—মা ! আমার 'বাবা' কে বলো না ! আমার কি 'বাবা' নেই ?

ছেলের আগ্রহ দেখে তার মা তাকে পিতার পরিচয় দিলে এবং আংটির কথাও ব'ল্‌লে। ছেলে ব'ল্‌লে,—তবে কেন তুমি আমাকে বাবার কাছে এতদিন নিয়ে যাওনি ?

তা'র মা ব'ল্‌লে—যখন শুন্‌লুম তিনি শত্রুদের হারিয়ে দিয়ে যুদ্ধে জয়লাভ ক'রেছেন, তখন আশা হয়েছিল, তিনি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতে নিশ্চয় এখানে আসবেন ; কিন্তু তিনি আর এলেন না ! আমাদের কথা একেবারে ভুলে গেছেন ব'লে আমি আর অভিমান করে তোমায় নিয়ে তাঁর কাছে যাইনি।...

কিন্তু পুত্রের আব্দার রাখতে, পিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিতে শেষে খোকাকে কোলে নিয়ে মেয়েটিকে রাজবাড়ীতে আসতেই হলো।

মহারাজ ব্রহ্মদত্ত পাত্রমিত্র সভাসদ নিয়ে রাজসভায় বসেছিলেন। ছেলেকে কোলে নিয়ে মেয়েটি একেবারে তাঁর সিংহাসনের সামনে এসে উপস্থিত হলো। মহারাজ তাকে দেখেই চিন্‌তে পারলেন। তা'র সে সুন্দর মুখখানি ভোলবার নয় ! কিন্তু সভার মাঝখানে সেই অজ্ঞাত-কুলশীলা মেয়েটিকে রাণী ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে তাঁর লজ্জা হ'লো ! তিনি ব'ল্‌লেন—তোমাকে তো আমি চিনি নি !—তুমি কে ?—

মেয়েটি ব'ল্লে—আমি এ রাজ্যের রাণী—আমার কোলে আপনার ভাবী উত্তরাধিকারী! এই দেখুন আপনার এই আংটি, এখন বোধ হয় স্মরণ হবে!

মহারাজ বিস্ময়ের ভাণ ক'রে ব'ল্লেন,—ওতো আমার আংটি নয়! মেয়েটি গম্ভীর ভাবে ব'ল্লে—এতে আপনারই নাম লেখা রয়েছে।

রাজা অপ্রতিভ হ'য়ে ব'ল্লেন—তাই নাকি? ও! বুঝেছি। সেবার উদ্যান-ভ্রমণে গিয়ে আমার একটি আংটি হারিয়েছিলো বটে। তুমি সেইটি কুড়িয়ে পেয়ে আজ আমাকে ঠকাতে এসেছো নিশ্চয়।

রাজার কথা শুনে রাগে অভিমানে দুঃখে মেয়েটি পাগলের মতো হ'য়ে উঠলো; কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ব'ললে—আমি যদি আপনাকে ঠকাতে এসে থাকি আর এ যদি রাজপুত্র না হয়, তা'হলে আমি একে এই আকাশে ছুঁড়ে দিচ্ছি ও এখনি এই পাথরের মেঝের উপরে আছড়ে পড়ে মরে যাক। কিন্তু, সত্যই যদি এ আপনার পুত্র হয় আর যথার্থই যদি আমি আপনার রাণী হই তাহ'লে ও কখনই পড়বে না, শূন্যে উঠেও স্থির হয়ে থাকবে।

ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে সেই সভার মাঝখানেই সে পুত্রকে আকাশের দিকে তুলে শূন্যে ছুঁড়ে দিলে। সমস্ত সভা-

শুদ্ধ লোক বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হ'য়ে দেখলে ছেলেটি শূন্যের উপরেই স্থির হয়ে রইল !—মাটিতে এসে পড়লো না ।

রাজা আর স্থির হ'য়ে থাকতে পারলেন না । সিংহাসন থেকে উঠে পড়ে ব্যগ্রভাবে ছেলের দিকে দু'হাত তুলে ব'ললেন—তুমি আমারই পুত্র ! আমারই পুত্র ! এসো—এসো ! আমার কোলে এসো—আমার বুকে এসো !

সভাশুদ্ধ লোক উঠেপড়ে সেই সুন্দর শিশুটিকে কোলে নেবার জন্য সাগ্রহে হাত তুলেছিলেন । কিন্তু ছেলেটি তার পিতার কোলেই ঝাঁপিয়ে পড়্লো !

সকলে রাণীর জয়ধ্বনি ক'রে উঠ্লো ।

মহারাজ তাকে বহুমানে মহিষীর পদে বরণ ক'রে নিলেন । সেদিন থেকে রাণী ও রাজপুত্রকে নিয়ে মহারাজ সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন ।

(গৌতমের সুবুদ্ধি বণিক জন্ম)

সেকালে বারাণসীতে দু'জন বেশ নামজাদা বণিক ছিল। তাদের মধ্যে একজন খুব বুদ্ধিমান আর একজন ভারি বোকা! সুবুদ্ধি যখন যা' ক'রতো নির্ব্বোধ অমনি তার দেখাদেখি তাই ক'রতো। একবার বুদ্ধিমান বেণে পাঁচশো গরুর গাড়ীতে অনেক রকম মাল বোঝাই দিয়ে বিদেশে বাণিজ্য করতে যাবার ব্যবস্থা ক'রলে। খবর পেয়ে বোকা বেণেও পাঁচশো গরুর গাড়ী যোগাড় ক'রে মাল চাপিয়ে বিদেশ যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। সুবুদ্ধি বেণে এ কথা শুনে ভাবলে—আমাদের দু'জনের এক হাজার গরুর গাড়ী যদি মাল বোঝাই হ'য়ে এক সঙ্গে যায়, তাহ'লে এতগুলি ভারী গাড়ীর চাকার চাপে রাস্তা খারাপ হ'য়ে যাবে, কারণ সেকালে সব মেটে রাস্তা ছিল, এখনকার মতো পাকা রাস্তা ছিল না। তা' ছাড়া

পথে যেতে যেতে একহাজার গাড়োয়ান আর দু'হাজার গরুর খোরাকও সব জায়গায় পাওয়া যাবে না। কাজে কাজেই সুবুদ্ধি বেণে স্থির ক'রলে যে আমাদের মধ্যে একজনের আগে যাওয়া উচিত, আর একজনের কিছু কাল পরে যাওয়া উচিত। এই ভেবে তিনি বোকা বেণেকে ডাকিয়ে এনে সবরকম অসুবিধার কথা বুঝিয়ে ব'লে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—এখন তুমি আগে যেতে চাও না আমার পরে যেতে চাও, ঠিক ক'রে বলো ?

বোকা ভাবলে—আগে যাওয়াই সুবিধা। কারণ, রাস্তা ভালো পাওয়া যাবে। পথের দু'ধারে যত ঘাস হ'য়েছে—আমার গাড়ীর গরুগুলো খেয়ে বাঁচবে। ভালো ফলমূল ও খাদ্যদ্রব্য পথে যেতে যা মিলবে আমার লোকজনেরা খেতে পাবে। স্নানের ও তৃষ্ণা নিবারণের জলও আমরা আগে গেলে প্রচুর পাবো। তা'ছাড়া, আমার গাড়ীর মালপত্র সব আগেই ইচ্ছা-মতো দামে বেচতে পারবো। এই মনে ক'রে বোকা বেণে ব'ললে—আমিই আগে যাবো।

বুদ্ধিমান বেণে ব'ললে—বেশ কথা; তা'হলে তুমিই আগে রওনা হও। আমি কিছুদিন পরে যাবো।

সুবুদ্ধি ভাবলে—শেষে যাওয়াই সুবিধা। বোকার

গাড়ীর চাকার চাপে উঁচুনীচু পথ সমান হ'য়ে যাবে। ওর গাড়ীর গরুগুলো পাকা ঘাস খাবে। আমি পরে গেলে—আমার গরুগুলো কাঁচা কাঁচা কচি ঘাস খেয়ে বাঁচবে। কারণ, ততদিনে পথের দু'ধারে আবার কচিঘাস গজাবে। আমার লোকজনেরাও পথে যেতে যেতে টাট্‌কা ফলমূল আর সদ্য-প্রস্তুত খাদ্য সামগ্রী পাবে। কোথাও জলের অভাব হ'লে এরা যে সব কূপ খুঁড়ে জল নিতে বাধ্য হবে, আমারা পরে গিয়ে সেই সব ওদেরই খোঁড়া কুয়োর জল ব্যবহার ক'রতে পারবো। সুতরাং, শেষে যাওয়াই ভালো।

বোকা বণিক এদিকে তার পাঁচশো গাড়ী নিয়ে যেতে যেতে ক্রমে লোকালয় ও মানুষের আবাস ছাড়িয়ে এক প্রকাণ্ড বালীয়াড়ির মাঠে এসে পড়লো। সে মাঠের কোথাও একবিন্দু জল পাওয়া যায় না। মানুষেরও চিহ্ন নেই কোথাও। ঠিক যেন একেবারে মরুভূমি!

সেই মাঠে রাক্ষসেরা এসে উৎপাত করে ব'লে পথিকেরা সে মাঠটা পার হবার সময় সকলে দল বেঁধে যাতায়াত ক'রতো। যারা ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে সেখানে বিশ্রামের জন্য অপেক্ষা কর'তো রাক্ষসেরা তাদের ধ'রে ধ'রে মেরে খেয়ে ফেলতো।

সে মাঠ পার হ'য়ে যেতে অনেকদিন লাগবে ব'লে—গাড়োয়ানরা বড় বড় জালায় জল ভ'রে গাড়ীতে তুলে নিলে এবং পাঁচশো গাড়ী সব কাছাকাছি স'রে এসে পিছু পিছু চ'লতে লাগলো।

বোকা বণিকের দল যখন প্রায় মাঠের মাঝা-মাঝি গিয়ে পৌঁছেচে, তখন রাক্ষস-রাজ শিকার পালায় দেখে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো। অনেক ভেবে চিন্তে স্থির ক'রলে যে এই বোকা বেণেকে বোকা-বুঝিয়ে ওর গাড়ীর জল সব ফেলিয়ে দিতে হবে। তারপর, জলের অভাবে ওর লোকজনেরা সব আর গাড়ীর গরুগুলো পর্য্যন্ত যখন পিপাসায় কাতর হ'য়ে মাঠের উপর ব'সে পড়বে তখন এদের ধ'রে ধ'রে মেরে মনের সাধে সকলে মিলে খাওয়া যাবে।

রাক্ষসরা মায়াবী! ইচ্ছা মাত্র তারা যে কোনো রূপ ধারণ ক'রতে পারে। রাক্ষস রাজ মায়াবলে তখনি একখানি সুন্দর রথ সৃষ্টি ক'রলে। দু'টি দুধের মতো ধবধবে সাদা গরু সেই রথ টানছে। রথের উপর রাজার মতো বেশে রাক্ষসরাজ নিজে বসেছে। তার মাথায় শ্বেত ও নীলপদ্মের ফুলের মুকুট! মাথার চুল আর কাপড় যেন সদ্য জলে ভিজে রয়েছে। তাঁর রথের

চাকায় কাদা মাখা। রথের সঙ্গে সঙ্গে দশবারোজন অনুচর চলেছে। তাদের হাতে অস্ত্র-শস্ত্র। তাদেরও গা-মাথা ভিজে রয়েছে। ভিজে চুলের উপর সাদা আর নীল পদ্ম গোছা ক'রে তোড়া বাঁধা। প্রায় সবারই মুখে মৃণালের টুক্‌রো। পায়ে কাদা লেগেছে।

বোকা বেণে তার দলের আগে আগে যাচ্ছিল। রাক্ষসরাজ তার মায়ারথ খানিকে বোকা বেণের পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে, ভারী মিষ্টি ক'রে নরম গলায় জিজ্ঞাসা ক'রলে—মহাশয় কোথা থেকে আস্‌ছেন?

বোকা বেণে রাক্ষস রাজার বেশ-ভূষা, রথ, গরু, ও লোকজন সব দেখে তাকে একজন খুব ধনী লোক ব'লে মনে ক'রলে। সসম্ভ্রমে তাঁ'র রথের জন্য পথ ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—মহাশয় বুঝি পথে বৃষ্টি পেয়েছিলন; বস্ত্রাদি সব ভিজে দেখ্‌ছি। এখানে কাছাকাছি কি কোথাও কোনো পদ্ম-দিঘী আছে? এতো টাট্‌কা পদ্ম আপনারা কোথায় পেলেন?—

রাক্ষসরাজ সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে ব'ললেন—হ্যাঁ মহাশয়! একটু আগেই খুব এক পশ্‌লা বৃষ্টি হ'য়ে গেলো। এই পথটা পার হলেই দেখবেন ঘন সবুজ বনের মধ্যে একেবারে অথৈ জলের পদ্ম-দিঘী রয়েছে।

বেণের বুদ্ধি—

ব'লতে ব'লতে—রাক্ষসরাজ এগিয়ে চ'ললো ; জলের গাড়ীগুলো দেখিয়ে ব'ললে—জল সঙ্গে এনে খুব বুদ্ধিমানের কাজ ক'রেছেন ! এতক্ষণ পথে জলকষ্ট ছিল বটে খুব। কিন্তু, এইবার অফুরন্ত জল পাবেন ! দু'ধারে কেবল সরোবর ! এখন এসব বড় বড় জলের জালা ফেলে দিয়ে—গাড়ীর বোঝা হাল্‌কা ক'রে ফেলুন, গাড়ী তা'হলে, খুব জোরে যেতে পারবে—

বোকা বেণে রাক্ষসরাজের কথা শুনে জলের জালা গুলো গাড়ী থেকে নামিয়ে ভেঙে ফেলে দিয়ে চ'ললো ! সামনেই সরোবর আছে জেনে এক ফোঁটাও খাবার জল পর্য্যন্ত সঙ্গে রাখলে না। বোঝা হাল্‌কা ক'রে নিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে গাড়ী ছুটিয়ে চ'ললো, নিকটস্থ পদ্ম-দিঘীর পাড়ে সে-দিনটির মতো বিশ্রাম নেবার আশায় !

রাক্ষসরাজের দল তখন অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। বোকা বেনের দল চ'লেছে-তো-চলেছেই ! যতদূরই যায়, পথ যেন আর ফুরোয় না ! কোথায় বা সে পদ্মহাসা সরোবর, আর কোথায়ই বা সে ছায়াশীতল সবুজ বন ! ধূ ধূ ক'রছে শুধু বালি আর মাঠ ! সারাদিন প্রচণ্ড রোদের তাপে চ'লে পিপাসায় তাদের গলা শুকিয়ে বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছিল ! অতি কষ্টে জলের আশায় বহুদূর

তারা এগিয়ে গেলো, কিন্তু, জলের চিহ্ন পর্য্যন্তও কোনোখানেই দেখতে পেলে না।

সূর্য্য অস্ত গেলো। আর তারা চ'লতে পারে না। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পথশ্রমে ক্লান্ত অবসন্ন হ'য়ে তারা সেই পথের ধারে মাঠের মাঝখানেই গাড়ী খুলে দিয়ে বিশ্রাম ক'রতে বসে গেলো। সবার টাগ্‌রা শুকিয়ে উঠেছে; সবাই ক'রছে তখন—জল!—জল! গাড়ীতে বলদ-গুলো পর্য্যন্ত ঘাস-জল না পেয়ে ছট্‌ফট ক'রতে লাগলো। গাড়োয়ানরা জলের অভাবে কেউ কিছুই রেঁধে-বেড়ে খেতে পেলে না। সারাদিনের পরিশ্রমের পর ক্ষিদের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে পড়লো সব। ক্রমে সন্ধ্যা হ'য়ে এলো। অন্ধকার রাত্রি!—বোকা বেণের দলের সকলেরই জল না-পেয়ে, খেতে না-পেয়ে—প্রাণ যায়-যায় হ'য়ে উঠেছে যখন; ঠিক সেই সময় রাক্ষসরাজ সদলে এসে তাদের আক্রমণ করে মেরে ফেললে। তারপর মহা আনন্দে রাক্ষসেরা সবাই পেট ভ'রে গরু আর মানুষের মাংস খেয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে চলে গেল।

বোকা বেণে বাণিজ্য করতে যাবার প্রায় দেড়মাস পরে বুদ্ধিমান বেণে তার পাঁচশো গাড়ী নিয়ে রওনা হ'লো। যথা সময়ে সেও সেই জলহীন মরুকান্তারে

এসে পড়লো ! বড় বড় জালার মধ্যে প্রচুর পানীয় জল ভরে নিয়ে বালির মাঠে যাত্রা করবার আগে বুদ্ধিমান বণিক তার দলের সকলকে ডেকে ব'লে দিলে যে—এইবার তোমরা যে মাঠ পার হবে সে মাঠের কোথাও জল পাওয়া যায় না, সুতরাং, তোমরা কেউ আমার বিনা অনুমতিতে এক ফোঁটা জলও ব্যবহার করবে না।

সুবুদ্ধি বেণের দল যথেষ্ট জল সঙ্গে নিয়ে সেই মাঠের অর্দ্ধেক পথ প্রায় যখন পার হয়ে গেছে, রাক্ষস-রাজ সেই সময় ঠিক যেমন ক'রে সেজে এসে বোকা-বেণেকে ভুলিয়ে ছিল, অবিকল তেমনি ক'রে সেজে এলো সুবুদ্ধি বেণেকেও ঠকাতে। বুদ্ধিমান বেণে তার চাল-চলন খানিকক্ষণ লক্ষ্য করে দেখেই বুঝতে পারলে—এ লোকটা সাধারণ মানুষ নয়—নিশ্চয় কোনো মায়াবী রাক্ষস! নইলে এই জলশূন্য মরুভূমির মাঝখানে কোথায় পেলে সে এত জল, যে ওর মাথার চুল ও গায়ের কাপড় ভিজে গেলো! এর চোখ দুটো লাল, চেহারাটা কেমন যেন গোঁয়ারের মতো! রোদের মাঝখানে তো কই, পথে এর ছায়া পড়ছেনা! এ কখনই মানুষ নয়।

হঠাৎ সুবুদ্ধি বেণের মনে হলো—বোকা বেণে এর পাল্লায় প'ড়ে প্রাণ হারায়নি তো?

রাক্ষসরাজ তখন বুদ্ধিমান বেণেকে বেশ গম্ভীর ভাবে উপদেশ দিচ্ছিলেন---জালার জল সব এইবার ফেলে দিয়ে বোঝা হাল্‌কা করে নিয়ে যান। সামনেই জলাশয় পাবেন।

বুদ্ধিমান বেণে তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে। ব'ললে---জলাশয় যখন দেখতে পাবো তখন নিজেরাই বুদ্ধি ক'রে জল ফেলে দিয়ে বোঝা হাল্‌কা ক'রে নেবো! আপনি কে মশাই, পথের মাঝখানে উপযাচক হ'য়ে পরামর্শ দিতে এসেছেন? এখনি দূর হয়ে যান্ এখান থেকে! আপনার নিশ্চয় কোনো মন্দ উদ্দেশ্য আছে!"

রাক্ষসরাজ তখন আর লজ্জায় পালাতে পথ পেলে না! এ লোকটির কাছে আর চালাকি চলবে না বুঝে সদলে মনের দুঃখে বাসায় ফিরে গেল!

বুদ্ধিমান বেণের সঙ্গের লোকেরা এবং গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানরা সকলে কিন্তু ব'লতে লাগলো---কথাটা তো কিছু মন্দ বলেনি লোকটি, মিছে কেন জলের বোঝা টেনে টেনে সারা হই প্রভু? ওরা তো ব'লে গেলো---খুব কাছেই নীলবন, সেখানে বড়ো বড়ো সরোবর রয়েছে। তাতে অসংখ্য পদ্মফুল ফুটেছে। ওদের হাতে পদ্ম, মাথায় কমল-মালা! ওরা মৃণাল

চিবুতে চিবুতে খাচ্ছে ! সবারই মাথার চুল, পরিধানের বস্ত্র, জলে ভিজে রয়েছে দেখলুম। সেখানে বৃষ্টিও হচ্ছে ওরা ব'ল্লে—তবে আবার এ ভূতের বোঝা ব'য়ে বেড়ানোর কি দরকার ? অনুমতি করেন তো জলের জালা গুলো ভেঙে ফেলে দিয়ে যাই, গাড়ীগুলো জোরে পারবে।

বুদ্ধিমান বেণে তার অনুচর ও গাড়োয়ানদের কথা শুনে হাসলে। ব'ললে—তোমরা দীর্ঘকাল এই পথ দিয়ে পণ্যদ্রব্য নিয়ে বাণিজ্যে যাতায়াত ক'রেছো—কখনো শুনেছো কি যে এই মরুকান্তারে কাছাকাছি কোথাও জলাশয় আছে ?

সবাই পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ব'ললে—আজ্ঞে না।

কাছেই ঘন নীলবন আছে ব'লছো—কিন্তু, তা'র অস্পষ্ট একটু ছায়াও কি দূর-দিগন্তে দেখতে পাচ্ছো কেউ ?

সকলে ব'ললে—না প্রভু, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না !

আচ্ছা, তোমরা ব'লছো যে অল্প দূরেই বৃষ্টি হয়েছে বা হ'চ্ছে—কিন্তু, বাতাস কি তোমাদের কারুর কাছে ঠাণ্ডা বোধ হ'চ্ছে ? তোমরা কি কেউ এ পর্য্যন্ত

জোলো হাওয়ার স্পর্শ পেয়েছো ? আকাশে কোথাও কি মেঘের চিহ্নমাত্র একটু আছে ? মেঘের গর্জ্জন কি এ পর্য্যন্ত শুনতে পেয়েছো কেউ ? বিদ্যুতের চমক্ কি একবারও তোমাদের কারুর চোখে পড়েচে ?

সবাই ব'ললে—আজ্ঞে না ! এসব কোনো লক্ষণই আমাদের চোখে পড়েনি !

সুবুদ্ধি বেণে তখন তাদের বুঝিয়ে দিলে যে—"যারা তোমাদের জল ফেলে দেবার জন্য পরামর্শ দিয়ে গেলো, তারা নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী শত্রু ! খুব সম্ভব এই মরু-কান্তারের রাক্ষস ওরা—মানুষ নয় কখনই ! মিথ্যা কথায় ভুলিয়ে আমাদের অনিষ্ট ক'রতে চায় ! চলো সব চট্‌পট্ গাড়ী হাঁকিয়ে। আমার মনে হ'চ্ছে হয়ত আমাদের আগে যে বণিক পাঁচশো গাড়ী বোঝাই দিয়ে এই পথে বাণিজ্য-যাত্রা ক'রেছিলেন—এরা তাঁদের মেরে ফেলেছে !

সুবুদ্ধি বেণের কথা শুনে সবাই তাড়াতাড়ি গাড়ী ছুটিয়ে দিলে। খানিকদূর গিয়েই তারা দেখতে পেলে পথের ধারে সেই বোকা বেণের পাঁচশো গাড়ী প'ড়ে রয়েছে ! আর, তার আশে-পাশে অসংখ্য মানুষ আর গরুর হাড় ছড়ানো !

ব্যাপার বুঝতে তাদের বিলম্ব হ'লোনা। বুদ্ধিমান বেণে তখন তাড়াতাড়ি নিজের যেসব গাড়ী পুরানো আর ভাঙা ছিল সেগুলি সব বদ্‌লে বোকা বেণের ভালো ভালো গাড়ীগুলি বেছে নিলে। বোকা বেণের গাড়ীতে যে সব দামী-দামী জিনিস ছিল, সেগুলিও সব নিজের গাড়ীতে তুলে নিলে এবং নিরাপদে বাণিজ্যক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে তিনগুণ মূল্যে নিজের মালপত্র সব বেচে প্রচুর টাকা লাভ ক'রে ধনী হয়ে দেশে ফিরে এলো।

হাঁচির মহিমা

(গৌতমের যুবরাজ জন্য)

সেকালে এক রাজার সভায় একজন খুব চালাক লোক এই ব'লে এসে চাকরী নিয়েছিল যে, সে তরবারীর আঘ্রাণ নিয়ে ব'লে দিতে পারে যে কোন্ অসি সুলক্ষণ-যুক্ত, এবং কোন্ অসি অমঙ্গলজনক! কোন্ তরবারীতে শত্রু-জয় হবে নিশ্চিত, আর কোন্ তরবারীতে পরাজয়ের কলঙ্ক অবশ্যম্ভাবী!

রাজা তার গুণের কথা শুনে তাকে রাজ্যের অসি-পরীক্ষক ক'রে দিলেন। রাজার সৈন্য-সামন্ত, অনুচর, প্রহরী প্রত্যেকের জন্য যখনি নূতন অসি কেনা হ'তো, আগে অসি-পরীক্ষক সেটি দেখে আঘ্রাণ নিয়ে যদি ব'লতো যে সে তরবারী সুলক্ষণযুক্ত তবেই তা' নেওয়া হ'তো, নইলে অসি-প্রস্তুতকারক কর্ম্মকারদের

তৎক্ষণাৎ তা ফেরত দেওয়া হ'তো। অসি-পরীক্ষক অনুমোদন না-ক'রলে রাজা নিজেও কোন তরবারী নিতেন না।

অসি-পরীক্ষক এই সুযোগ পেয়ে, যারা তাঁকে গোপনে কিছু টাকা ঘুস্ দিতো, কেবলমাত্র তাঁদের তরবারীই সে সুলক্ষণযুক্ত আর মঙ্গলকর ব'লে রায় দিতো, এবং যারা তাকে কিছু দিতো না, তাদের অসি সে অলক্ষণযুক্ত ও অকল্যাণকর ব'লে ঘোষণা ক'রতো। সুতরাং তাদের তরবারী আর বিক্রয় হ'তো না।

একজন অসি-প্রস্তুতকারক এই রকম বারবার হতাশ হ'য়ে শেষে অসি-পরীক্ষককে জব্দ করবার জন্যে একটা উপায় খুঁজতে লাগলো। ভাবতে ভাবতে তার মাথায় একটা বেশ ভালো মতলব এসে গেলো। মহারাজের জন্য এইবার একখানি খুব ধারালো তরবারী প্রস্তুত ক'রে তাতে বেশ ক'রে সূক্ষ্ম মরীচের গুঁড়ো মাখিয়ে খাপের মধ্যে পু'রে সে রাজার কাছে নিয়ে গেল। মহারাজ তাঁর অসি-পরীক্ষককে ডেকে সেই তরবারী-খানি পরীক্ষা ক'রে দেখবার আদেশ দিলেন। লোকটি তখন খাপ থেকে তরবারীখানি বার ক'রে তাতে নাক ঠেকিয়ে আঘ্রাণ নিতে লাগ্‌লো। যেমন আঘ্রাণ

নেওয়া—অমনি সঙ্গে সঙ্গে তার নাকের মধ্যে মরীচের গুঁড়ো ঢুকে গেলো, এবং সে এমন জোরে হেঁচে উঠলো যে—তরবারীখানিও ঠিক্‌রে উঠে তার নাকে লেগে নাকটি বেমালুম উড়ে গেলো। ঝর্ ঝর্ ক'রে কাটা-নাক দিয়ে রক্ত প'ড়তে লাগলো!

রাজা তখন তাড়াতাড়ি রাজবৈদ্যকে ডাকিয়ে এনে অসি-পরীক্ষকের নাকের চিকিৎসা ক'রতে ব'ললেন। রাজবৈদ্য ব'ললে,—মহারাজ। এ কাটা-নাক আর জোড়া লাগবেনা, তবে আমি গালা দিয়ে ওঁর এমন একটি নকল নাক তৈরী ক'রে দেবো যে কেউ দেখে টের পাবেনা যে ওঁর নাক নেই। মহারাজ অগত্যা তাই করবার আদেশ দিলেন। রাজবৈদ্য তখন গালা রং ক'রে অসি-পরীক্ষকের এমন একটি কৃত্রিম নাক তৈরী ক'রে দিলেন যে কেউ দেখে বুঝতে পারতোনা যে তার নাক নেই। কিন্তু, তা'হলে কি হবে, তরবারী পরীক্ষা ক'রতে গিয়ে অসি-পরীক্ষকের যে নাকটা উড়ে গেছে এ খবর তখন দেশময় রাষ্ট্র হয়ে গেছলো। সবাই তাকে নাক-কাটা ওস্তাদ্ ব'লে উপহাস ক'রতে সুরু ক'রে দিলে।

মহারাজ তা'র উপর দয়া-পরবশ হ'য়ে তাকে আর চাকুরী থেকে তাড়ালেন না। সে তাঁর কাজে বাহাল

রইলো বটে, কিন্তু অসি-পরীক্ষা আর ক'রতে সাহস হতোনা তার।

এদিকে সেই রাজার একটি মাত্র কন্যা ছাড়া কোনো পুত্র-সন্তান না-থাকায় তিনি তাঁর এক ভাগিনেয়কে কাছে রেখে পুত্রের মতো প্রতিপালন ক'রছিলেন। তাকেই সকলে রাজকুমার ব'লে ডাকতো এবং সেই যে সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী এ কথাও জানতো।

ছেলেবেলা থেকেই একসঙ্গে থাকা, একসঙ্গে খেলা-ধূলা করা, ও লেখাপড়া শেখা হচ্ছিল ব'লে রাজকন্যা ও রাজকুমার দুজনে দুজনের প্রতি নিবিড় স্নেহে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েছিল। রাজা তাদের দু'জনের এই প্রগাঢ় সদ্ভাব দেখে খুব খুশী হ'য়ে একদিন পাত্র, মিত্র ও সভাসদ্ এবং মন্ত্রীদের ডেকে ব'ললেন যে—তিনি তাঁর এই ভাগিনেয়-কেই রাজ্য দেবেন এবং এর সঙ্গেই রাজ-কুমারীর বিবাহ হবে। রাজার এই প্রস্তাবে সকলেই আনন্দের সঙ্গে সম্মত হলো। কারণ, সেকালে ভাইয়ের মেয়ের সঙ্গে বোনের ছেলের বিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল।

কিন্তু, এই ঘটনার কিছুদিন পরে রাজার মত আবার বদলে গেলো। তিনি স্থির ক'রলেন যে, ভাগিনেয়র সঙ্গে অন্য একজন প্রতাপশালী রাজার কন্যা এনে বিবাহ

দেবেন এবং রাজকুমারীরও বিবাহ দেবেন অন্য কোনো সম্ভ্রান্ত রাজার সঙ্গে। এর ফলে আর দুটি রাজ্যের সঙ্গে আমার রাজ্যের একটা বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা হবে, ভবিষ্যতে আমারই নাতিরা দুটি রাজ্যে রাজত্ব করবে।

রাজা আবার সব পাত্রমিত্র, সভাসদ্ ও অমাত্যদের ডাকিয়ে এনে পরামর্শ করলেন। তারা সকলে এক-বাক্যে ব'ললে—মহারাজ! উত্তম প্রস্তাব ক'রেছেন কিন্তু, রাজকন্যাকে কুমার বাহাদুর অত্যন্ত ভালো-বাসেন। রাজকন্যাও কুমার বাহাদুরের একান্ত অনুগত। তা'রা দু'জনেই এখন বড়ো হ'য়েছে! আপনি যদি তাদের বিবাহ দিতে ইচ্ছা না করেন তা'হলে দু'জনকে আর একসঙ্গে এক বাড়ীতে রাখবেন না। ওদের দু'জনকে পরস্পারের কাছ থেকে তফাৎ ক'রে দিন। দূরে-দূরে পৃথক বাড়ীতে দু'জনকে রাখুন, যাতে ওরা কেউ কারুর সঙ্গে আর দেখা-সাক্ষাৎ ক'রতে না-পারে। দীর্ঘকাল পরস্পরকে দেখতে না-পেলে ওরা দু'জনে দুজনকে ভুলে যেতে পারে।

রাজা এই পরামর্শই গ্রহণ করলেন এবং সেই দিনই রাজকন্যা ও কুমার বাহাদুরের জন্য স্বতন্ত্র বাসের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু কুমার ও কুমারী দু'জনে

পরস্পরের এত বেশী স্নেহানুরক্ত হ'য়ে প'ড়েছিল যে তারা পৃথক বাড়ীতে পরস্পরকে ছেড়ে একদিনও থাকতে পারছিল না। উভয়ের জন্য উভয়েরই মন কেমন করছিল। রাজকুমার দিবারাত্রি চিন্তা ক'রতে লাগলো যে কি উপায়ে রাজ-কুমারীর সঙ্গে আবার একত্র হওয়া যায়! ওদিকে রাজকন্যাও কুমার বাহাদুরের জন্য ভেবে ভেবে অসুস্থ হ'য়ে পড়লো!

রাজকুমার নিরুপায় হ'য়ে শেষে এক দৈবজ্ঞ বৃদ্ধার শরণাপন্ন হ'লো। তাকে হাজার টাকা পুরস্কার দিয়ে কাতরভাবে অনুরোধ করলে যে তুমি রাজকুমারীর অসুখ ভালো ক'রে দাও এবং তাকে আমার কাছে এনে দাও! দৈবজ্ঞ বৃদ্ধার অদ্ভুত ও অসাধারণ মন্ত্রশক্তির কথা সবাই জানতো। রাজকুমারকে দেখে তার মনে দয়া হ'লো! সে ব'ললে—কোনো ভয় নেই রাজকুমার। এই সামনের অমাবস্যার দিন রাত্রেই আপনি রাজ-কন্যাকে পাবেন। কিন্তু সেদিন সশস্ত্র লোকজন নিয়ে আপনাকে শ্মশানে আসতে হবে। অনুচরদের শ্মশানের লাগোয়া জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে বলবেন। আর আপনি একটি শবের মতো শ্মশানে প'ড়ে থাকবেন। আমি রাজকন্যাকে নিয়ে দৈবক্রিয়া করবার নাম ক'রে

শ্মশানে নিয়ে আসবো। রাজা নিশ্চয়ই বহু সৈন্য সামন্ত ও অনুচরবর্গ সঙ্গে দেবেন। আমি তাদের নিয়ে শ্মশানে আসবো এবং শবসাধনার নাম ক'রে আপনার পিঠের উপর পাতা আসনে নিয়ে গিয়ে বসাবো। আপনি সেই সময় একটা হেঁচে উঠবেন। আমি তখন রাজার লোক-জনদের দৈবকোপের ভয় দেখিয়ে—রাজকুমারীকে শ্মশানে আপনার কাছে ফেলে রেখেই তাদের নিয়ে পালিয়ে যাবো। সেই ফাঁকে আপনিও রাজকুমারীকে নিয়ে পালিয়ে যাবেন।

কুমার বাহাদুর দৈবজ্ঞ বৃদ্ধার এই পরামর্শ মতো কাজ করতে তৎক্ষণাৎ রাজি হলো। রাজকুমারীকে না-দেখে কুমার একদিনও থাকতে পারছিল না। দৈবজ্ঞ বৃদ্ধা তখন রাজার কাছে গিয়ে ব'ললে—মহারাজ! রাজকন্যা পীড়িতা হ'য়েছেন শুনে গণনা ক'রে দেখলুম যে তাঁকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দৈবক্রিয়া করতে হবে, নইলে তাঁর প্রাণের আশঙ্কা আছে! মহারাজ শুনে কন্যার জন্য চিন্তিত হয়ে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ রাজ-কুমারীকে শ্মশানে যাবার অনুমতি দিলেন।

দৈবজ্ঞ বৃদ্ধা তখন রাজকুমারীর কাছে গিয়ে কুমারের সঙ্গে তার যে রকম পরামর্শ স্থির হ'য়েছে

সমস্ত গোপনে তাকে জানালে। রাজকুমারী শুনে খুশী হ'য়ে তখনি দৈবজ্ঞ বৃদ্ধাকে নিজের গলার বহুমূল্য মণিহার খুলে উপহার দিলে এবং রাজকুমারের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হয়ে সেই মুহূর্তে শ্মশানে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। দৈবজ্ঞ বৃদ্ধা রাজকুমারীকে অনেক বুঝিয়ে নিরস্ত করলে। ব'ললে—আজ নয় রাজকন্যা, সামনের অমাবস্যার রাত্রে এসে তোমায় কুমারের কাছে নিয়ে যাবো।

তারপর অমাবস্যার রাত্রি এলো। রাজকুমারী শ্মশানে যাবার জন্য উপযুক্ত বেশভূষা করে দৈবজ্ঞ বৃদ্ধার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। দৈবজ্ঞ বুড়ি যথাসময়ে এসে হাজির হ'লো। মহারাজ বহু লোকজন, দাস, দাসী ও সৈন্য-সামন্ত কন্যার সঙ্গে দিলেন!

শ্মশানে যেন এক সমারোহ ব্যাপার লেগে গেলো! শৃগাল কুকুর শকুনী গৃধিনী সব যে-যার ভয়ে পালালো! রাজ-অনুচরদের হাতের মশালের আলোয় অমাবস্যার রাত্রের ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার দূর হয়ে শ্মশান একেবারে দিনের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

রাজকুমার আগেই ছদ্মবেশে শ্মশানে এসে মড়ার মতো উপুড় হ'য়ে পড়েছিলেন একপাশে। দৈবজ্ঞ

বুড়ি নানারকম ভড়ং ক'রে মন্ত্র আউড়ে তার উপরে এক আসন পাতলে এবং রাজকুমারীকে সেই আসনে বসাতে নিয়ে যাবার আগে সবাইকে ডেকে ব'লে দিলে—তোমরা সব খুব সাবধানে সতর্ক হয়ে থাকো! রাজকুমারী শবের পিঠের ওই আসনে গিয়ে বসলেই ঐ মরামানুস ভূতাবিষ্ট হ'য়ে উঠে সামনে যাকে দেখতে পাবে তাকেই ধ'রে গিলে খেয়ে ফেলবে!—খুব সাবধান! ব'লতে ব'লতে দৈবজ্ঞ বুড়ি রাজ-কন্যাকে নিয়ে গিয়ে কুমারের পিঠের উপর পাতা আসনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলে। রাজার অনুচর সৈন্য সামন্ত প্রহরী সবারই দৈবজ্ঞ বুড়ির কথা শুনে পর্য্যন্ত ভয়ে বুক দুর্ দুর্ করছিল। রাজকুমারী শবের পিঠে গিয়ে বসতেই কুমার নাকে মরীচের গুঁড়া দিয়ে একটা হেঁচে উঠলো! যেমন হেঁচে ওঠা দৈবজ্ঞ বুড়ি অমনি বাপ্‌রে! মাগো! খেলেরে! পালা! পালা!—ব'লে চীৎকার ক'রতে ক'রতে নিজেই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাতে সুরু ক'রলে। তার দেখাদেখি দাস, দাসী, লোক জন, রাজ অনুচর, সৈন্য সামন্ত যে যেখানে ছিল সব টেনে ছুট মারলে!—কেউ পাগ্‌ড়ী ফেলে—কেউ জুতো ফেলে—কেউ সড়কী ফেলে, কেউ বল্লম ফেলে প্রাণভয়ে সব

—হাঁচির মহিমা

পালালো। মশালচীরাও সব মশাল ফেলে দৌড়।—নিমেষের মধ্যে শ্মশান ফাঁক হ'য়ে গেলো! রাজকুমারী যে একলাটি পড়ে রইলো সেখানে—এ কথা আর কারুর মনেই রইল না!

রাজকুমার তাদের রকম দেখে আর থাকতে পারলে না, হেসে ফেললে! তারপর রাজকুমারীকে আদর ক'রে হাত ধ'রে নিয়ে গিয়ে নিজের রথে উঠে বসলো।

মহারাজ তার পরদিন জানতে পারলেন যে তাঁর ভাগিনেয়ই সেই রাত্রে তাঁর কন্যাকে শ্মশান থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে গেছে। তখন তাঁর মনে হ'লো যে এদের পৃথক করাটাই তাঁর অন্যায় হ'য়েছিল। এরা ছেলেবেলা থেকে এক সঙ্গে দু'জনে মানুষ হ'য়েছে। দু'জনে দু'জনকে ছাড়া আর কাউকে জানে না। এদের দু'জনের যদি বিবাহ না দিই তাহ'লে এরা জীবনে হ'য়ত সুখী হ'তে পারবে না! এই ভেবে মহারাজ তাঁর মত পরিবর্ত্তন ক'রে সেই ভাগিনেয়র সঙ্গেই মহাসমারোহে কন্যার বিবাহ দিলেন এবং তাকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে রাজপদে অভিষিক্ত ক'রলেন।

রাজকুমার ও রাজকুমারী তখন রাজা ও রাণী হ'য়ে পরম সুখে রাজ্য ক'রতে লাগলো।

সেই নাক-কাটা গোঁসাইকে একদিন রাজদর্শনে এসে অনেকক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'লো। সেদিন রোদের তাপে তার গালার নাকটি গ'লে খসে পড়লো! সবাই হেসে উঠ্‌লো! নূতন রাজা দেখে ব'ললেন—"ভয় নেই, আমি আবার আপনার নাক গড়িয়ে দেবো! আপনি হাঁচির দোষে আপনার নাকটি খুইয়েছেন বটে, কিন্তু, আমি সেই হাঁচির মহিমাতেই আজ রাজকন্যা ও রাজত্ব পেয়েছি!

(গৌতমের সেরিবান্ ফেরিওয়ালা-জন্ম)

বহুকাল আগে সেরিব নগরে একজন ফেরিওয়ালা ছিল, তার নাম সেরিবান্। সেই শহরেই আরও এক জন ফেরিওয়ালা থাকতো তার নাম—সেরিবা! সেরিবান্ আর সেরিবা দু'জনে একই রকম সব জিনিসপত্র ফেরি ক'রে বেড়াতো! কিন্তু সেরিবার অর্থলোভ এত বেশী ছিল যে সে সুযোগ পেলেই খরিদ্দারকে ঠকাতো। সেরিবান্ কিন্তু কখনো এমন অন্যায় কাজ ক'রতো না।

একবার সেরিবান্ আর সেরিবা দু'জনে এক সঙ্গে নদীপার হয়ে অন্ধপুর নগরে ফেরি করে বেড়াতে

গেলো। সেখানে তারা কে কোন রাস্তায় কতক্ষণ ফেরি ক'রে বেড়াবে সেটা আগে থেকেই দু'জনে আপোষে একটা বন্দোবস্ত ক'রে নিলে। ঠিক হ'লো যে একজন যে রাস্তায় ফেরি ক'রে গেছে আর একজন আর সে রাস্তায় যাবে না। কিন্তু সেরিবা সেরিবানের এ প্রস্তাবে সম্মত হলো না! তখন এই স্থির হলো, যে দু'জনে এক সঙ্গে কোনো রাস্তায় ফেরি করবে না। তবে একজন এক রাস্তায় ফেরি ক'রে যাবার পর, আর একজন সে রাস্তায় ফেরি ক'রতে যেতে পারবে।

সেরিবার এ প্রস্তাবে সেরিবান্ রাজি হলো এবং দু'জনে দুটি পৃথক রাস্তায় ফেরি ক'রতে সুরু ক'রলে। অন্ধপুরে আগে একজন খুব ধনী শ্রেষ্ঠি বাস করতো কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যবসায় বাণিজ্যে তাদের একবার এতো বেশী লোকসান হ'য়ে গেলো যে তারা একেবারে গরীব হ'য়ে পড়'লো! দুঃখ কষ্ট সহ্য ক'রতে না পেরে পুরুষেরা সবাই একে একে অল্প বয়সে অকালে মারা গেলো। বংশের মধ্যে রইলো কেবল একজন বৃদ্ধা-পিতামহী আর তার একটি বালিকা নাত্‌নি। তারা দুটিতে অতি কষ্টে পাড়াপ্রতিবেশীদের বাড়ী কাজ কর্ম্ম ক'রে দিন চালাতো।

তারা যে রাস্তায় থাকতো সেরিবা সেই রাস্তায় ফেরি ক'রতে ঢুকেছিল। "কে কি কিন্‌বে গো!" ব'লে হাঁকতে হাঁকতে সেরিবা তার পণ্য দ্রব্যের ঝুড়ি নিয়ে পথদিয়ে যাচ্ছিল। শ্রেষ্ঠিদের ছোট মেয়েটির কিছু কেনবার ভারি সখ হ'লো। সে তার ঠাকুরমার কাছে গিয়ে বায়না ধ'রলে—"ঠাকুরমা! আমায় কিছু কিনে দাও!"

ঠাকুরমা ব'ললেন—"কি কিনবি খুকী?"

মেয়েটি ব'ললে—"সকলের গহনা আছে, আমার কিছু নেই! আমাকে তুমি গহনা কিনে দাও?"

নাতনির আব্‌দার শুনে ঠাকুরমার চোখ দু'টি জলে ভরে উঠলো! তিনি একটু ধরা গলায় ব'ললেন—"খুকী! আমরা যে বড় গরীব দিদি! গহনা কেনবার পয়সা পাবো কোথায়?"

বালিকা ব'ললে—"কেন? তুমি তো বাসন বেচে পয়সা পাও! কতদিন তো দেখেছি পয়সা নেই ব'লে রান্না হচ্ছে না দেখে তুমি বাসন বেচে টাকা এনেছো!"

ঠাকুরমা একটু ম্লান হেসে ব'ললেন—"পাগ্‌লী আমার!—বাসন কি আর ঘরে আছেরে? সবই যে আমি ঘুচিয়েছি।

খুকী ব'ললে—"আমি কাল সিঁড়ির নীচের জঞ্জালের মধ্যে একখানা বাসন পড়ে আছে দেখেছি—নিয়ে আসবো দেখবে ?—"

ব'লতে ব'লতে চঞ্চলা হরিণীর মতো ছুটে গিয়ে সে সিঁড়ির নীচে থেকে সেই বাসনখানি উদ্ধার ক'রে নিয়ে এলো ! ব'ললে—"বাসনখানা তো আমাদের কোনো কাজে লাগে না ঠাকুরমা ! এইটে কেন বদ্‌লে তুমি আমাকে গহনা কিনে দাওনা !

ঠাকুরমা দেখলেন—সত্যিইত, নাতনি তাঁর কোথা-থেকে একখানা পুরাণো ময়লা মরচেধরা থালা টেনে বার ক'রে এনেছে ! তিনি আর আপত্তি করলেন না, ব'ললেন—"আচ্ছা ভাই ; ফেরিওয়ালাকে তুমি ডাকো ; দেখি তোমার জন্যে কি পাওয়া যায় ?"

নাত্‌নি ছুটে গিয়ে ফেরিওয়ালাকে একেবারে হাত ধরে বাড়ীর ভিতরে টেনে নিয়ে এলো !

ঠাকুরমা তাকে থালাখানি দেখিয়ে ব'ললেন—"এর বদলে আমার এই নাত্‌নীকে কিছু গহনা দেবে কি বাছা ?—"

সেরিবা থালাখানি উল্টে পাল্টে দেখে বুঝতে পারলে যে ধুলো আর ময়লায় ঢাকা প'ড়ে থালাখানি

কালো হ'য়ে রয়েছে বটে, কিন্তু এখানি নিশ্চয় সোনার থালা ! এই মনে ক'রে সে থালাটির একদিকে একটা পেরেক ঘসে দাগ কেটে দেখলে যে তার অনুমান মিথ্যে নয়। কিন্তু বুড়িকে সে কথা কিছু ব'ললে না। তার লোভ হ'লো যে, এই থালাখানা এদের ঠকিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এর অনেক দাম ! এমন ভালো খাঁটী সোনা এখন আর পাওয়াই যায়না। এই থালাখানা ভোগাদিয়ে নিয়ে যেতে পারলে—তাকে আর পথে পথে ঘুরে ফেরিওয়ালার ব্যবসা ক'রতে হবেনা !

এই ভেবে সে মুখে ব'ললে—"না মা, এ আমি নেবো না। এর আর দাম কি ? আধ্‌লা-পয়সাও হবে না ! এ নিলে আমায় ঠ'কতে হবে।—" এই ব'লে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে থালাখানা ফেলেদিয়ে সেরিবা তার মালপত্রের ঝুড়ি তুলে নিয়ে বেরিয়ে চলে গেলো।

ঠাকুরমা আঁচলে তাঁর জলভরা চোখছুটি মুছে ব'ললেন—"দেখলি তো দিদি ! ওর কোনো দাম নেই ! সাধে কি আর সিঁড়ির নীচেয় জঞ্জালের মধ্যে পড়েছিল ?" মেয়েটির কচি মুখখানি বাসিফুলের মত শুকিয়ে গেলো !

সেরিবা সে রাস্তায় ফেরি করে যাবার কিছু পরেই সেরিবাস্ এসে ঢুকলো !

"কেউ কিছু কিনবেন কি?" ব'লে হাঁকতে হাঁকতে সেরিবান্ সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল; মেয়েটি শুন্‌তে পেয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠে ব'ল্‌লে—"ঠাকুরমা! ঐ আর একজন যাচ্ছে! ডাকবো?"

একটু বিষাদের হাসি ঠাকুরমার মুখে ফুটে উঠলো! তিনি ব'ললেন—"তোর ও বাসনখানি যে কেউ নিতে চাচ্ছেনা খুকু! মিছে ডেকে কি হবে ভাই! আমাদের যখন টাকা নেই, তখন গহনা পরা কি ভালো?"

বালিকা ব'ল্‌লে—"ও ফেরিওয়ালাটা লোক ভালো নয় ঠাকুরমা! ওর কথা শুন্‌লে রাগ হয়। বাসনের বুঝি আবার আধপয়সাও দাম হয় না? তাকি হয়? আমি একে ডেকে জিজ্ঞাসা করি! এর গলাটী বেশ মিষ্টি, বোধহয় ভাল লোক হ'তে পারে! এ যদি এই বাসনখানি নেয় তাহ'লে আমাকে গহনা দেবে নিশ্চয়!"

ঠাকুরমা অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে কেবল নাতনীর মন ভুলোবার জন্যেই ব'ললেন!—"আচ্ছা ডাক্!"

তখন, সেরিবান্‌কে মেয়েটি ডেকে নিয়ে এলো। সেরিবান্ থালাখানি পরীক্ষা করে দেখে বল্‌লে "মা-ঠাকরুণ, এ যে খুব দামী জিনিস! এ সোনা আজকাল

আর পাওয়া যায় না। এ থালার দাম লাখ টাকারও বেশী হবে! এতোটাকা তো আমার কাছে নেই মা!"

বুড়ি শুনে অবাক হ'য়ে বল'লে—"সেকি বাবা? তামাসা ক'রছোনা তো? এই একটু আগে আর একজন ফেরিওয়ালা এসেছিল—সে যে বলে গেলো এর আধ-পয়সাও দাম নয়?"

সেরিবান্ বুঝতে পারলে—এ নিশ্চয় সেরিবার চালাকি। সে বল'লে—"না, মা, আমি তামাসা করিনি। এ সত্যিই বহুমূল্য সোনার থালা!"

বুড়ি বল'লে—"তবে বাবা এ নিশ্চয় তোমার মতো পুণ্যবানের ছোঁয়া লেগে সোনা হ'য়ে গেছে! তা এ থালাখানি আমি তোমাকেই দিলুম। তুমি নিয়ে যাও। আর, এর বদলে তোমার যা ইচ্ছা হয় আমার এই নাতনিটির জন্য দিয়ে যাও।"

সেরিবানের ঝুড়িতে তখন প্রায় পাঁচশো টাকার জিনিস ছিল এবং পাঁচশো টাকা নগদও ছিল। সে থালা-খানি নিয়ে তার বদলে ঝুড়ি শুদ্ধ সমস্তই তাদের দিলে। কেবল পারে যাবার মতো কিছু নৌকাভাড়া আর তার দাঁড়ি-পাল্লা ও থলেটি হাতে ক'রে সে তৎক্ষণাৎ খেয়া ঘাটের দিকে হন্‌-হনিয়ে চলে গেলো। সেখানে তখন

—সোণার থালা

মাত্র একখানি ওপারে যাবার নৌকা ছিল। সেরিবান্ তাতে উঠে মাঝীর হাতে ডবল ভাড়া দিয়ে ব'ললে—"শীঘ্র আমাকে নদীর ওপারে নিয়ে চলো।" মাঝী নৌকা ছেড়ে দিলে।

এদিকে সেরিবা সে থালা খানি ফেলে কিছুতেই বেশীদূর যেতে পারলে না। থালাখানি নেবার জন্যে তার ভয়ানক লোভ হয়েছিল, সে একটু পরেই আবার সে বাড়ীতে ফিরে এলো। বুড়িকে ডেকে ব'ললে,"কই গো! সে থালাখানি আর একবার দেখি!"

বুড়ি ব'ললে—"কেন বলোতো?"

সেরিবা ব'ললে—"ভেবে দেখলুম, ও থালাখানার জন্যে তোমাদের কিছু না-দেওয়াটা ভালো দেখায় না!

বুড়ি ব'ললে—"একটু আগে আসতে হয়! এই মাত্র আর একজন ফেরিওয়ালা এসে আমাদের হাজার টাকা দিয়ে সেই পুরাণো থালা খানা নিয়ে গেছে। বেচারি বাড়ী গিয়ে আফ্‌শোস ক'রবে হয়তো!"

কথাটা শুনেই সেরিবার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'য়ে গেলো! সে চীৎকার করে উঠে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"কখন এসেছিল?—কখন নিয়ে গেলো?—কোনদিকে গেলো!"

বুড়ি ব'ল্‌লে—"যেন তাড়াতাড়ি সে নদীর পথে গেলো বলে' মনে হলো! তুমি একটু জোরে গেলে এখনো তাকে পথে ধরতে পারবে—"

"পারবো? পারবো ধরতে? বেটা চোর! বদ-মাইস্! আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে গেছে! আমার লাখ টাকা লুটেছে!" ব'লতে ব'লতে পাগলের মতো সেরিবা তার মালপত্র টাকাকড়ি সব সেখানে ছড়িয়ে ফেলে রেখে নদীর ঘাটে ছুটলো! সেখানে পোঁছে দেখে নৌকা তখন মাঝ-নদীতে ভাসছে! সে উন্মত্তের মতো চেঁচাতে লাগলো—"নৌকা ফেরাও! নৌকা! ফেরাও!" কিন্তু, সেরিবান্ কিছুতে আর মাঝীকে ফিরতে দিলে না! সোণার থালা নিয়ে সেরিবান্ ওপারে চলে গেলো দেখে সেই মুহূর্ত্তে সেরিবা এপারে হিংসেয় দমফেটে ম'রে গেলো!

ধনুর্দ্ধর

(গৌতমের পেটে ধনুর্দ্ধর-জন্ম)

একজন বেঁটে আর কুঁজো পণ্ডিত ধনুর্ব্বেদে অদ্বিতীয় হয়ে উঠেছিল। তার বিদ্যাবুদ্ধিও ছিল অসাধারণ। কিন্তু তার মর্কটের মতন চেহারা দেখে কোনো রাজাই তাকে চাকরি দিলে না। সে মনের দুঃখে যখন বাড়ী ফিরে যাচ্ছে সেই সময় তাঁতি পাড়ার ভিতর দিয়ে যেতে যেতে দেখলে একটা লোক বসে তাঁত বুনছে, তার খুব লম্বা-চওড়া চেহারা। দেখলে মনে হয় যেন ভীমের মতো পালোয়ান! বেঁটে পণ্ডিত ঠিক ক'রলে যে, একে যদি কোনো রাজসভায় নিয়ে গিয়ে অসামান্য ধনুর্দ্ধর ব'লে এর পরিচয় দিই, তাহ'লে নিশ্চয়ই সে রাজা একে চাকুরি দেবেন। এই ভেবে বেঁটে পণ্ডিত গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলে—

"তোমার নাম কি?"

"আমার নাম ভীমসেন ?"

"ঠিক নামই হয়েছে। কিন্তু এমন বলশালী বিরাট দেহ নিয়ে তুমি এখানে বসে তাঁত বুনছো কেন ?

"নইলে কি করবো ? দিন চলে না যে!"

"তুমি আমার সঙ্গে চলো। আমি একজন অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর ; কিন্তু আমার চেহারা ভালো নয় ব'লে রাজসভায় চাকরি পাচ্ছিনি। তুমি রাজকে গিয়ে আস্ফালন ক'রে বলবে যে তুমি একজন মহা ধনুর্দ্ধর। তোমার সমকক্ষ দেশে কেউ নেই। তাহ'লে রাজা তোমার চেহারা দেখে সে কথা বিশ্বাস ক'রবেন এবং তোমাকে মোটা মাইনেয় চাকরিতে বাহাল ক'রবেন। তিনি তোমাকে যখন যা' ক'রতে হুকুম দেবেন, আমি তোমার সঙ্গে থেকে তৎক্ষণাৎ তা' ক'রে দেবো। এইভাবে আমাদের দু'জনের বেশ আরামে দিন চ'লে যাবে। রাজবাড়ীতে খুব সুখে থাকবো আমরা।"

বেঁটে পণ্ডিতের কথা শুনে ভীমসেন রাজি হ'য়ে গেলো। বেঁটে তখন ভীমসেনকে সঙ্গে নিয়ে কাশীর রাজসভায় গিয়ে হাজির হ'লো। রাজাকে অভিবাদন ক'রে কি ব'লতে হবে বেঁটে পণ্ডিত ভীমসেনকে পাখী-পড়ার মতো সব শিখিয়ে দিয়েছিল।

রাজা জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"তোমরা কে? কি জন্যে আমার কাছে এসেছো?"

ভীমসেন রাজাকে প্রণাম ক'রে ব'ললে—"মহারাজ! আমি অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর! এ জম্বুদ্বীপে আমার সমতুল্য কেউ নেই। আমি আপনার কাছে থাকতে চাই।"

রাজা বল'লেন—"তোমার চেহারা দেখে তোমার কথা বিশ্বাস হ'চ্ছে বটে। আমার এখানে যদি চাকুরি করো কি মাইনে চাও বলো।"

ভীমসেন ব'ললে—"পনেরো দিন অন্তর হাজার টাকা ক'রে দিতে হবে। অর্থাৎ মাসে আমরা দু'হাজার টাকা বেতন চাই।"

রাজা ব'ললেন—"আমরা ব'লছো কেন? তুমি ছাড়া আর কেউ আছে না কি? তোমার সঙ্গের ঐ বেঁটে মর্কট লোকটা কে?"

ভীমসেন ব'ললে—"আজ্ঞে, ও আমার বেঁটে চাকর! বড় বিশ্বাসী মহারাজ। আমি যেখানে যাই, ওকে সর্ব্বদা সঙ্গে রাখি। তাই আমরা বলেছিলুম।"

রাজা শুনে ব'ললেন—"ও! আচ্ছা বেশ, তুমি আর তোমার বেঁটে চাকর আজ থেকেই আমার কাছে কাজ করো। মাসে দু'হাজার টাকা ক'রেই পাবে।"

ভীমসেনকে নিয়ে বেঁটে পণ্ডিত সেদিন থেকেই রাজবাড়ীর কাজে লেগে গেলো। মহারাজ ধনুর্দ্ধরকে যা' হুকুম ক'রতে লাগলেন বেঁটে পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ তা' ক'রে দিতে লাগলো। এমনি ক'রে তারা দু'জনে রাজবাড়ীতে বেশ আরামে দিন কাটাচ্ছিল। হঠাৎ একদিন রাজার কাছে খবর এলো যে কাশী রাজ্যের এক বনে একটা প্রকাণ্ড বাঘ বেরিয়ে রোজ অনেক লোক মারছে। মহারাজ ভীমসেনকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"কী হে ধনুর্দ্ধর, তুমি গিয়ে বাঘ-টাকে ধ'রে আনতে পারবে ?"

শুনে ভীমসেনের মুখ শুকিয়ে গেলো। তবু, বেঁটে পণ্ডিতের ভরসায় সে কাষ্ঠ-হাসি হেসে ব'ললে—"মহারাজ! একটা তুচ্ছ বাঘই যদি না ধ'রে আনতে পারি, তাহ'লে বৃথাই আমার ধনুর্দ্ধর হওয়া! হুকুম করুন, আমি আজই বেরিয়ে প'ড়ছি।"

রাজা শুনে খুশী হ'য়ে তাকে পথ খরচের জন্য অনেক টাকা দিলেন, এবং তার যত লোকজন সঙ্গে নেবার ইচ্ছে নিতে পারে—এই হুকুম দিলেন।

ভীমসেন বাসায় গিয়ে বেঁটে পণ্ডিতকে সব বললো।

বেঁটে পণ্ডিত শুনে ব'ললে—"বেশ কথা। তুমি এখনি যাও, বাঘটা ধ'রে নিয়ে এসো—।"

ভীমসেন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"তুমি কি যাবো না ?"

বেঁটে ব'ললে—"না ; আমি যাবো না। কিন্তু, তোমার কোনো ভয় নেই, আমি একটা সহজ উপায় ব'লে দিচ্ছি শোনো, তাইতেই কাজ হবে।"

"কী ভাই বলো ! কিন্তু, তুমি যাবে না শুনে আমার যে ভরসা হ'চ্ছে না !"

ভীমসেন একেবারে কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে উঠলো। বেঁটে পণ্ডিত তাকে সাহস দিয়ে ব'ললে—"খবরদার ! তুমি একলা সে বনে গিয়ে ঢুকোনা। সঙ্গে অন্ততঃ দু'হাজার ভালো শিকারী তীরন্দাজ নাও। তাদের দিয়ে বন ঘেরাও ক'রো, তারপর যখন দেখবে যে বাঘটা বেরিয়ে পড়েছে, তখন তুমি ঝাঁ ক'রে বনের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে। তোমার দু'হাজার তীরন্দাজ চক্ষের নিমেষে বাঘটাকে মেরে ফেলবে। তুমি কাণ খাড়া ক'রে রেখো। যেই বুঝবে যে বাঘটা তাদের হাতে মারা পড়েছে, তখন তুমি একহাতে তোমার তীর, আর একহাতে ধনুক

নিয়ে মুখে একটা জঙ্গলের মোটা লতা দাঁতে চেপে ধ'রে মহা আস্ফালন ক'রতে ক'রতে বন থেকে বেরিয়ে এসে তাদের উপর খুব তর্জ্জন গর্জ্জন ক'রে ব'লবে—"কে এ বাঘ মারলে ? কার হুকুমে তোমরা বাঘটাকে মেরে ফেললে ! আমি যেই একটু বনে গেছি একটা লতা কেটে আনতে, বাঘটার গলায় বেঁধে গরুর মতো তাকে রাজার কাছে টেনে নিয়ে যাবো ব'লে, আর তোমরা কিনা অমনি সেই ফাঁকে বাঘটাকে মেরে বসলে ? —ছি ছি ! তোমরা এমন ভীরু জানলে তোমাদের আমি সঙ্গে আনতুম না ! রাজা শুনলে কী ভাববেন বলো তো ?—" তখন তোমার তীরন্দাজেরা ভয় পেয়ে তোমাকে কাকুতি মিনতি ক'রে অনুরোধ জানাবে যে একথা রাজাকে যেন না জানানো হয় ! এ জন্যে তারা তোমাকে অনেক টাকা ঘুষ দেবে, তখন তুমি ব'লবে—"যাক্, তোমরা গরীব মানুষ, ক'রে ফেলেছো একটা অন্যায় কাজ ! আচ্ছা, ভয় নেই তোমাদের ; এ দোষ আমি নিজের ঘাড়েই নেবো।"...তারপর রাজা যখন জানতে পারবেন যে তুমিই বাঘটাকে মেরেছো, তখন তিনিও আবার তোমাকে প্রচুর পুরস্কার দেবেন।"

ভীমসেন ব'ললে—"বাঃ ! এতো ভারি চমৎকার

বুদ্ধি বার ক'রেছো! চলুন তাহ'লে এখনি বাঘ মারতে।" তারপর, ভীমসেন সেই বনে গিয়ে বেঁটে পণ্ডিত ঠিক্ যেমন যেমন ব'লে দিয়েছিল সেইভাবে কাজ ক'রে বাঘ মেরে বিজয় গর্ব্বে রাজধানীতে ফিরে এলো। দেশশুদ্ধ লোকে তার বীরত্বের প্রশংসা ক'রতে লাগলো। রাজা তাকে অনেক টাকা পুরস্কার দিলেন।

কিছুদিন পরে আবার এক খবর এলো যে, একটা বুনো মহিষ ক্ষেপে রাজপথে বেরিয়ে এসে ভয়ানক কাণ্ড ক'রছে। রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ। বহু লোককে সে গুঁতিয়ে মেরে ফেলেছে।

রাজা শুনে তৎক্ষণাৎ ভীমসেনকে ডেকে হুকুম দিলেন—"মহিষ বধ ক'রে এসো।"

ভীমসেন এসে বেঁটে পণ্ডিতের শরণাপন্ন হ'লো। বেঁটে পণ্ডিত তাকে একটা সহজ উপায় ব'লে দিলেন। ভীমসেন সেই উপদেশ মতো কাজ ক'রে এবারও মহিষ-বধে কৃতকার্য্য হ'য়ে ফিরে এলো। শহর শুদ্ধ লোক তাকে ধন্য ধন্য ক'রতে লাগলো। মহারাজ তাকে এবারও প্রচুর ধনরত্ন পুরস্কার দিলেন। ভীমসেন রাজার খুব প্রিয় ধনুর্দ্ধর হ'য়ে উঠলো। তার অনেক পয়সা হ'লো সে বড়লোক হ'য়ে গেলো। তখন

টাকার অহঙ্কারে সে বেঁটেকে অগ্রাহ্য ক'রতে লাগলো। আর তার পরামর্শ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা ক'রতো না। এখন কথায় কথায় ব'লতো—"তুমি না হ'লে বুঝি আর আমার দিন চলবে না?—তুমি কি মনে করো—তুমি ছাড়া আর কেউ মানুষ নেই?"

বেঁটে পণ্ডিত তাঁতির এই দুর্ব্বুদ্ধি দেখে মনে মনে হাসতো, কিছু ব'লতো না।

এমনি ক'রে দিন যায়। হঠাৎ কাশীরাজ্যের একে বারে মহাবিপদ উপস্থিত হ'লো! এক শত্রু রাজা বহু সৈন্য সঙ্গে নিয়ে এসে কাশী শহর ঘিরে ফেলে কাশী রাজাকে ব'লে পাঠালে—"হয় আমার হাতে রাজ্য ছেড়ে দিয়ে চলে যাও, নয়ত' এসে আমাকে যুদ্ধে হারা-বার চেষ্টা করো!"

মহারাজ ভীমসেনকে ডেকে পাঠিয়ে হুকুম দিলেন,—"ধনুর্দ্ধর! এইবার তোমার শক্তি দেখাও। এই শত্রু রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে বন্দী করে নিয়ে এসো।"

ভীমসেনের মাথায় একেবারে বজ্রাঘাত!—সে বেচারা যুদ্ধ কাকে ব'লে তাই জানে না!—তার বুকের ভিতর দুর্ দুর্ ক'রে কাঁপতে লাগ্‌লো!

এদিকে রাজার হুকুমে পুরবাসিনী মেয়েরা তাকে

যুদ্ধ-সাজ পরিয়ে দিয়ে প্রধান সেনাপতিরূপে বরণ ক'রতে সুরু ক'রে দিলে। রাজার সব চেয়ে বড় হাতীকে রণ বেশ পরিয়ে আনা হ'লো! ভীমসেন কিন্তু তখন চোখে অন্ধকার দেখছে। অন্যান্য সেনাধ্যক্ষেরা এসে প্রধান সেনাপতি ভীমসেনকে অভিবাদন ক'রে ব'ললে—"চলুন প্রভু! আপনার হাতী প্রস্তুত, আর বিলম্ব ক'রবেন না! শত্রু শহর ঘিরে ফেলেছে!"

কিন্তু ভীমসেনের পা' আর নড়ে না। ভয়ে তার সর্ব্বশরীর তখন পাথরের মতো ঠাণ্ডা ও আড়ষ্ট হ'য়ে গেছে। ঠিক সেই সময় কোথা থেকে বেঁটে পণ্ডিত এসে সকলকে ডেকে ব'ললে—"তোমরা সব অগ্রসর হও, প্রধান সেনাপতি তাঁর ইষ্ট-পূজা সেরে এখনি জয়যাত্রা ক'রবেন। কোনো ভয় নেই! অবিলম্বে শত্রু বিনাশ ক'রে উনি শহর মুক্ত ও নিরাপদ ক'রবেন।"

বেঁটেকে দেখে ভীমসেনের যেন ধড়ে প্রাণ এলো। ছুটে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধর'লে। বেঁটে সেই সময় তার কাণে কাণে বলে দিলে,—"কোনো ভয় নেই—হাতীতে উঠ্‌বে চলো। এই দেখো আমিও যুদ্ধের বেশে সজ্জিত হ'য়ে এসেছি, তোমার সঙ্গে যাবো, তোমার পাশেই থাকবো।"

ভীমসেন তখন অনেকটা আশ্বস্ত হ'য়ে হাতীর পিঠে গিয়ে উঠলো। বেঁটেও তার পাশে উঠে বসলো। দামামা জয়ঢাক বাজিয়ে হাতী ছুটিয়ে দেওয়া হ'লো। সঙ্গে সঙ্গে কাশীর সৈন্য-সামন্তরাও সব চ'ললো।

কাশীরাজের দল শত্রু সৈন্যের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই শত্রু সৈন্যদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেলো। তারা সব রণোল্লাস ক'রে উঠলো। চারি-দিক থেকে তুরী ভেরী দামামা প্রভৃতি রণ-বাদ্য বেজে উঠলো! রণ-ভেরীর শব্দ শুনেই ভীমসেন হাতীর পিঠে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলো! বেঁটে তার অবস্থা দেখে ব'ললে—"তুমি এখনি হাতীর উপর থেকে পড়ে যাবে! একটু স্থির হয়ে ব'সো, তোমাকে আমি হাতীর পিঠের উপর দড়ী দিয়ে বেঁধে রাখি। কিন্তু, তাকে বাঁধতে গিয়ে বেঁটে দেখলে যে, ভীমসেন ভয়ে হাতীর পিঠে বসে বসেই তার কাপড় চোপড় সব নোংরা ক'রে ফেলেছে! বেঁটে তখন তাকে খুব ব'কলে! ধিক্কার দিয়ে বল'লে—"ছি ছি! তুমি এমন অপদার্থ! যুদ্ধক্ষেত্র দেখেই কাপড়ে-চোপড়ে অসামাল হ'য়ে পড়লে! যাও, এখনি হাতীর উপর থেকে নেমে চুপি চুপি পালাও। আমি এখনি যুদ্ধ জয় ক'রে ফিরে আসছি।

ভীমসেন তখন পালাতে পারলেই বাঁচে! সে তৎক্ষণাৎ হাতীর পিঠ থেকে নেমে চুপি চুপি সরে পড়লো। বেঁটে তখন অদ্ভুত কৌশলে সৈন্য সাজিয়ে নিয়ে যুদ্ধ ক'রতে সুরু ক'রলে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই শত্রুকে হারিয়ে দিয়ে বিপক্ষ রাজাকে জীবিত অবস্থায় বন্দী ক'রে কাশীরাজের সামনে এনে হাজির ক'রে দিলে!

কাশীরাজ বেঁটের বীরত্বের পরিচয় পেয়ে খুব খুশী হ'লেন এবং তাকে প্রচুর ধনরত্ন পুরস্কার দিলেন। বেঁটের সেদিন থেকে সমস্ত জম্বুদ্বীপে সর্ব্ব প্রধান ধনুর্দ্ধর ব'লে খ্যাতি রটে গেলো।

(গৌতমের অন্যতম পূর্বজন্ম)
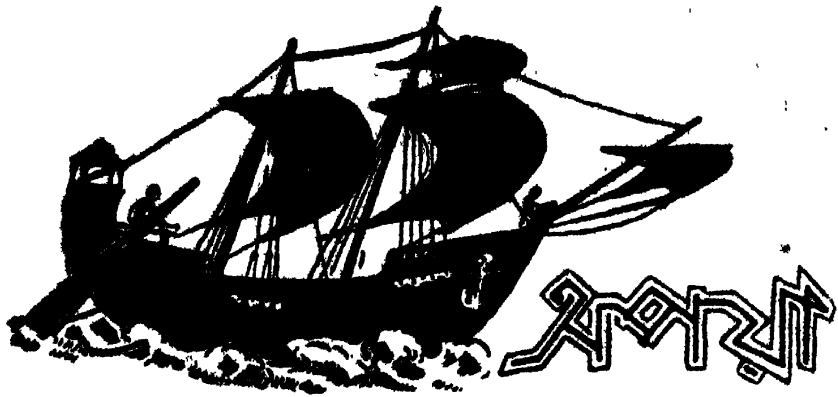
মিত্রবিন্দক নামে ছিল এক ভিখারীদের ছেলে। ভিক্ষা ক'রেই তার বাপ মা'র দিন চ'লতো। কিন্তু মিত্রবিন্দক জন্মাবার পর থেকে তাদের দুঃখ আরও বাড়লো; শেষে তাদের এমন দুর্গতি হ'লো যে লোকের বাড়ীর ভাতের ফ্যান আর আমানী খেয়ে তারা কোনো রকমে বেঁচে ছিল। ক্রমে তা'ও আর জুটতো না। যা' পাওয়া যেতো সে খেয়ে তিন জনের পেট ভ'রতো না। রোজই তাদের আধপেটা খেয়ে থাকতে হ'তো। মিত্রবিন্দকের বাপ মা তখন ছেলেকেই সব অনিষ্টের মূল মনে ক'রে একদিন তাকে মেরে তাড়িয়ে দিলে।

মিত্রবিন্দক পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে শেষে বারাণসী

শহরে এসে উপস্থিত হ'লো। বারাণসী শহরে তখন একজন অধ্যাপক পণ্ডিত থাকতেন। তাঁর টোলে প্রায় পাঁচশো ছেলে বিদ্যা শিক্ষা ক'রতো। বারাণসীর লোকেরা নিয়ম ক'রেছিল যে গরীব দুঃখীর ছেলেদের তাঁরা খেতে-পরাতে দেবেন এবং তাদের লেখা পড়া শেখবার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। মিত্রবিন্দককে তার দুঃখী বাপ-মা তাড়িয়ে দিয়েছেন শুনে তাঁরা মিত্রবিন্দককে সেই পণ্ডিতের টোলে ভর্ত্তি ক'রে দিলেন। মিত্রবিন্দক সেখানে ঐ পণ্ডিতের শিষ্য ও ছাত্ররূপে থেকে পড়াশুনা ক'রতে লাগলো। কিন্তু, মিত্রবিন্দক ছিল ভারি দুষ্ট। টোলে সারাদিন সে ভয়ানক উৎপাত ক'রতো। সহপাঠী ছেলেদের সঙ্গে রোজ তার মারামারি দাঙ্গা হ'তো।

গুরুদেব তাকে দণ্ড দিয়ে, ভর্ৎসনা ক'রে কিছুতেই শোধরাতে পারলেন না। সেও তাঁকে মোটেই ভয় পেতো না। পণ্ডিত মশাইকে গ্রাহ্যই ক'রতো না। টোলে এরকম একজন ছাত্র আছে জেনে পণ্ডিতের টোলের ভয়ানক নিন্দে হ'তে লাগলো। অনেক লোক তাদের ছেলেদের সেখান থেকে ছাড়িয়ে নিলে। পণ্ডিতের আয় একেবারে কমে গেলো। টোল বন্ধ

হবার উপক্রম হ'লো। মিত্রবিন্দকের জন্যেই তাঁর এই দুরবস্থা বুঝতে পেরে পণ্ডিত একদিন তাকে মেরে তাড়িয়ে দেবার সঙ্কল্প করলেন। মিত্রবিন্দক সেটা জানতে পেরে সেখান থেকে পালিয়ে গেলো।

অনেকদিন ধ'রে অনেক জায়গা ঘুরে মিত্রবিন্দক শেষে কাশীরাজ্যের সীমান্তে একখানি ছোট্ট গ্রামে গিয়ে হাজির হ'লো। সেখানে সে রোজ মজুরের কাজ ক'রে দিন কাটাতে লাগলো। কিছু দিন পরে সেই-গ্রামেরই একটি ভিখারীর মেয়েকে সে বিয়ে ক'রলে। ক্রমে মিত্রবিন্দকের দু'টি ছেলেও হ'লো। মিত্রবিন্দক কাশীর সেই বিখ্যাত পণ্ডিতের শিষ্য ছিলো জেনে গ্রামের লোকেরা তাকে শিক্ষকপদে নিযুক্ত ক'রলে, তার বাসের জন্য একখানি কুটির নির্ম্মাণ ক'রে দিলে এবং গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য মাসিক একটা বেতনও ঠিক ক'রে দিলে।

মিত্রবিন্দক সেখানে বসবাস সুরু ক'রতেই গ্রামবাসীদের সকলের ভয়ানক অনিষ্ট হ'তে লাগলো। তারা রাজার কোপে পড়লো। একবার নয়, দুবার নয়, সাত-সাতবার তাদের রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত হ'তে হ'লো। ক্রমে তারা বুঝতে পারলে যে মিত্রবিন্দকের জন্যই তাদের এই দুর্গতি হ'চ্ছে, নইলে আগে তো কখনো তাদের

কোনো বিপদ হয়নি। মিত্রবিন্দক এসে পর্য্যন্তই তাদের গ্রামের যত অনিষ্ট হ'চ্ছে। তখন তারা দল বেঁধে মিত্রবিন্দককে লাঠি-পেটা ক'রে সপরিবারে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিলে।

মিত্রবিন্দক মনের দুঃখে স্ত্রী ও পুত্রদের নিয়ে গ্রাম নগর জনপদ সব পার হ'য়ে এক গভীর বনে গিয়ে প্রবেশ ক'রলে। দুর্ভাগ্যক্রমে সে বনে রাক্ষসরা বাস ক'রতো। মিত্রবিন্দক সপরিবারে সেখানে গিয়ে ঢুকতেই রাক্ষসেরা তার স্ত্রী আর ছেলে দুটিকে ধ'রে খেয়ে ফেললে। মিত্রবিন্দক সময় থাকতে বন ছেড়ে পালিয়ে এসে বেঁচে গেলো।

বন থেকে পালিয়ে এসে মিত্রবিন্দক অনেক দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ালে। কিন্তু, কোথাও তার স্থান হ'লো না। সে যেখানেই যায়, সেখানেই লোকের অনিষ্ট হয়, এমনিই সে অপয়া। তখন সে জীবনে হতাশ হ'য়ে সমুদ্রে প্রাণ বিসর্জ্জন ক'রতে চ'ললো। সমুদ্রের ধারে গিয়ে দেখে সেই সময় বন্দর থেকে একখানি জাহাজ যাত্রী ও মাল বোঝাই হ'য়ে বিদেশে যাচ্ছে। মিত্রবিন্দক সুযোগ বুঝে সেই জাহাজের একজন কর্ম্মচারী হ'য়ে বিদেশ চ'ললো।

কিন্তু, জাহাজ-বন্দর ছেড়ে সমুদ্রের মাঝ বরাবর গিয়ে আর চলে না। অকালে অসময়ে সেদিন পথে ঝড় জল তুফান উঠ্‌লো, শেষে সমুদ্রের তলায় পাহাড়ে ঠেকে আট্‌কে যাবার মতো জাহাজখানা সমুদ্রের উপর এক জায়গায় আটকে রইলো। কিছুতেই আর একটুও নড়লো না।

তখন জাহাজ শুদ্ধ লোক ব্যস্ত হ'য়ে সন্ধান ক'রতে সুরু ক'রলে যে তাদের মধ্যে কে এমন 'অপয়া' আছে যার জন্য জাহাজ নড়ছে না—হঠাৎ অকালে এমন দুর্য্যোগ হচ্ছে! তারা পাশা ফেলে গণনা ক'রে দেখলে! বার বার সাতবারই জাহাজের নূতন কর্ম্মচারী মিত্রবিন্দকের নাম উঠ্‌লো। কাজেই তারা মিত্রবিন্দককে ধ'রে একটা বাঁশের ভেলার সঙ্গে বেঁধে সমুদ্রের মাঝখানে ফেলে দিলে। মিত্রবিন্দককে ফেলে দিতেই তৎক্ষণাৎ দুর্য্যোগও থেমে গেলো। জাহাজও বেশ তর্ তর্ ক'রে চলতে সুরু ক'রলে।

মিত্রবিন্দক ভেলায় চড়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর ভাসতে ভাসতে চললো। অনেক দূর গিয়ে সে দেখলে সমুদ্রের উপর একখানি স্ফটিক নির্ম্মিত তরণীতে চারজন দেবকন্যা যাচ্ছেন। মিত্রবিন্দক তাঁদের শরণাপন্ন হ'লো।

তারা এক সপ্তাহ মিত্রবিন্দককে বেশ সুখেই রাখলে। কিন্তু, এক সপ্তাহ পরে দেবকন্যাদের আবার দুঃখ ভোগ ক'রতে আর এক জায়গায় যেতে হ'লো। কারণ, তাদের পাপ পুণ্যের হিসাব অনুসারে এই দেব-কন্যারা সাতদিন ক'রে সুখে থাকতো, আর সাতদিন ক'রে দুঃখ ভোগ ক'রতো। দুঃখ ভোগ ক'রতে যাবার সময় তারা মিত্রবিন্দককে ব'লে গেলো—"বন্ধু, আমরা সাতদিন পরেই ফিরে আসবো, তুমি কোথাও যেওনা, এইখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করো।"

কিন্তু, তারা চলে যাবার পর মিত্রবিন্দকের আর সেখান থাকতে ভালো লাগলো না। সে তার ভেলা ভাসিয়ে আরও এগিয়ে চ'ললো। খানিকদূর গিয়ে দেখে একখানি রূপোর নৌকোয় চ'ড়ে আটজন দেব-কন্যা যাচ্ছেন। মিত্রবিন্দক তাদের আশ্রয় না-নিয়ে আরও এগিয়ে চললো। কিছুদূর গিয়ে সে দেখলে এক-খানি উজ্জ্বল মণিময় নৌকায় ষোলোজন দেবকন্যা যাচ্ছেন। তাঁরা মিত্রবিন্দককে ভেলা থেকে তাঁদের নৌকায় তুলে নিতে চাইলেন, কিন্তু মিত্রবিন্দক গেলো না। সে ভাবলে—আরও একটু এগিয়ে দেখা যাক্ এর চেয়েও ভালো কিছু দেখতে পাওয়া যায় কিনা।

আরও খানিক দূর এগিয়ে মিত্রবিন্দক দেখলে এক-খানি মস্তবড় সোনার নৌকায় চব্বিশজন দেবকন্যা নৃত্য গীত ক'রতে ক'রতে চ'লেছেন। তাঁরা মিত্রবিন্দককে দেখতে পেয়ে—কতো ডাকা ডাকি ক'রলেন তাঁদের সোনার নৌকায় উঠে আসবার জন্য। কিন্তু, তাদের কথায় কর্ণপাত না ক'রে মিত্রবিন্দক আরও এগিয়ে চললো। সে ভাবলে আরও আগে নিশ্চয় আরও ভালো কিছু দেখা যাবে। কিন্তু এবার সে এক জনশূন্য দ্বীপে গিয়ে পৌঁছালো। সে দ্বীপে যক্ষিণীরা বাস ক'রতো। মিত্রবিন্দককে দেখতে পেয়ে এক যক্ষিণী ছাগলের রূপ ধ'রে সেখানে বিচরণ ক'রতে লাগলো। মিত্রবিন্দক সমুদ্রে অনেক দিন কিছু খেতে পায়নি। ছাগলটিকে দেখতে পেয়ে ভাবলে একে মেরে আজ ভালো ক'রে মাংস রেঁধে খেতে হবে।

কিন্তু, ভেলা থেকে দ্বীপে নেমে মিত্রবিন্দক যেই সে ছাগলটিকে ধর'তে গেছে, মায়াবিনী যক্ষিণী তাকে এমন একটি লাথী মারলে যে, সে তৎক্ষণাৎ সমুদ্র পার হ'য়ে একেবারে বারাণসীর নগরপ্রান্তে ছিট্‌কে গিয়ে পড়লো। সেখানে বারাণসীর রাজার একপাল ছাগল চরছিল। কিছুদিন থেকে রোজই রাজার ছাগল চুরি যাচ্ছে

ব'লে ছাগলের রক্ষক যারা, তারা সেদিন চোর ধরবার জন্যে ওঁৎ পেতে লুকিয়ে বসেছিল। মিত্রবিন্দক সেখানে অনেক ছাগল দেখতে পেয়ে ভারি খুশী হ'লো। কিন্তু, মাংস খাবার লোভ আর তখন তার ছিল না। সে ভাবছিল সেই সমুদ্রের উপর সোণার নৌকোয় যে চব্বিশটি পরমা সুন্দরী দেবকন্যা তাকে আশ্রয় দিতে চেয়েছিল—সেইখানে কী ক'রে ফেরা যায়! হঠাৎ তার মনে হ'লো—সমুদ্রের সেই দ্বীপ থেকে একটা ছাগলের লাথী খেয়েই যখন আমি এখানে এসে পড়েছি, তখন, এখান থেকেও একটা ছাগলের লাথীতে নিশ্চয় সেখানে গিয়ে প'ড়বো। এই ভেবে সে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে একটা বেশ বড় দেখে ছাগলের ঠ্যাং চেপে ধরলে। ছাগলটা ভয়ে 'ব্যা' 'ব্যা' ক'রে চীৎকার ক'রতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে অমনি রাজার ছাগল রক্ষীর দল লাঠি নিয়ে তেড়ে এলো। "তবে রে—ব্যাটা চোর!—রোজ রোজ এমনি ক'রে রাজার ছাগল চুরি ক'রে খাচ্ছো—আর দণ্ড দিতে হ'চ্ছে আমাদের!—আজ আর র'ক্ষে নেই তোর!" ব'লতে ব'লতে তারা গিয়ে মিত্রবিন্দককে ধ'রে ফেললে এবং পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে মারতে মারতে রাজার কাছে নিয়ে চ'ললো।

এমন সময় বারাণসীর সেই অধ্যাপক পণ্ডিত,—যাঁর টোলে মিত্রবিন্দক প্রথম এসে ঢুকেছিল, তিনি সেই পথ দিয়ে তাঁর পাঁচশো শিষ্য নিয়ে নদীতে স্নান ক'রতে যাচ্ছিলেন, ছাগ-রক্ষকেরা কা'কে ধ'রে মারতে মারতে নিয়ে আসছে দেখতে গিয়ে—তিনি মিত্রবিন্দককে চিনতে পারলেন এবং ছাগ-রক্ষকদের জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"ওকে তোমরা মারতে মারতে কোথায় বেঁধে নিয়ে যাচ্ছো? ও যে আমার একজন শিষ্য।" ছাগ-রক্ষকেরা বল'লে—"ঠাকুর! অপরাধ নেবেন না। একে না ধ'রে কি করি বলুন? রোজ রোজ রাজার ছাগল চুরি ক'রে নিয়ে পালায়, কিন্তু দোষ হয় আমাদের। আজ এ যেমন একটা ছাগলের পা' ধ'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, অমনি আমরা ছুটে এসে ধ'রে ফেলেছি।"

পণ্ডিত ব'ললেন—"বুঝতে পারছি ও খুব অন্যায় কাজ ক'রেছে। কিন্তু, এবারকার মতন তোমরা ওকে মাপ করো। ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। আমি ওকে আমার টোলে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখবো। আর কখনো যাতে এমন গর্হিত কার্য্য ও না করে—আমি তার ব্যবস্থা করবো।"

ছাগ-রক্ষকেরা শুনে ব'ললে—"যে আজ্ঞে ঠাকুর,

আপনি যখন একে শোধরাবার ভার নিতে চাইছেন— নিয়ে যান তবে। আমাদের কোনো আপত্তি নেই।"

এই ব'লে তারা মিত্রবিন্দককে পণ্ডিতের হাতে ছেড়ে দিয়ে চ'লে গেলো। পণ্ডিত তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"এতদিন তুমি কোথায় ছিলে ?"

মিত্রবিন্দক সজল চোখে পণ্ডিতকে তার সমস্ত বৃত্তান্ত জানালে।

পণ্ডিত তাকে অভয় দিয়ে নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন এবং তাকে ব'লেদিলেন যে,—"তুমি যদি আমার কথা শুনে চ'লতে তাহ'লে তোমার এমন দুর্গতি হতো না। হিতৈষী গুরুজনদের অবাধ্য হ'লে এমনি দুর্দ্দশাই হয়। এবার থেকে যা' ব'লবো তাই শুনে যদি চলো তোমার মঙ্গল হবে।"

মিত্রবিন্দকের যথেষ্ট শিক্ষা হ'য়েছিল। সে তার-পর থেকে পণ্ডিতের কথা শুনে চ'লতে লাগ্‌লো এবং পরিণামে সুখী হ'লো।

(গৌতমের নাপিত-কথা)

বহুকাল আগে রাজা ব্রহ্মদত্তর আমলে কাশীতে একজন খুব ধনী শ্রেষ্ঠী ছিল। তার নাম ইল্লীস্। ইল্লীসের আশী কোটী সোনার মোহর ছিল, কিন্তু সে এমন কৃপণ ছিল যে অন্যকে দান করা দূরে থাক্ নিজের জন্যেও কখনো একটি পয়সাও খরচ কর্'তো না। অথচ তার বাপ-ঠাকুরদাদারা সাতপুরুষ ধ'রে অকাতরে দান-ধ্যান ক'রে গেছেন। লোকে তাই ইল্লীসের এমন নীচ স্বভাব দেখে তার নাম কর্'তো না, সবাই তাকে ব'লতো "কিপ্টে বেণে।"

ইল্লীস্ দেখতেও অতি কদাকার ছিল। সে খোঁড়া, কুঁজো, তার চোখ টেরা! পয়সা খরচ হবার ভয়ে ধর্ম্ম-কর্ম্ম ক'রতো না কিছু। তার পিতার মৃত্যুর পর সে

যখন বড়ীর কর্ত্তা হ'লো তখন দানশালা, অতিথিশালা সব বন্ধ ক'রে দিলে। ভিখারী ভিক্ষা ক'রতে এলে ইল্লীস্ তাদের মেরে তাড়িয়ে দিতো। যত টাকা পেতো সবই সে জমাতো, কিছু খরচ ক'রতো না।

একদিন কি একটা কাজে রাজবাড়ী থেকে ফেরবার সময় পথে সে দেখলে মদের দোকানের ধারে একজন লোক ব'সে বেশ আরামে মদ খাচ্ছে। দেখে ইল্লীসের সেদিন একটু মদ খাবার ভারি লোভ হ'লো। কিন্তু পয়সা খরচ হবার ভয়ে সে অতি কষ্টে লোভ সংবরণ ক'রে বাড়ী ফিরে এলো। কিন্তু মদ খাবার ইচ্ছেটা তার কিছুতে গেলো না। একটুখানি সুরাপানের জন্য তার প্রাণটা যেন একেবারে ছট্‌ফট্ ক'রতে লাগ্‌লো। অথচ পয়সা খরচ ক'রতেও মায়া হ'চ্ছে। বেচারী নিরুপায় হ'য়ে বাড়ীর ভিতর এসে শোবার ঘরে ঢুকে বিছানার উপর হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো।

ইল্লীসের স্ত্রী স্বামীর অসুখ করেছে মনে ক'রে তাড়াতাড়ি ছুটে এলো। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"কী হ'য়েছে?—অসুখ ক'রেছে কি?"

ইল্লীস্ ব'ললে—"না, আমার কোনো অসুখ করেনি!"

"তবে কি রাজা তোমার উপর বিরক্ত হ'য়েছেন ? তিনি কি রাগ ক'রেছেন ?"

"না-না—রাজা কেন আমার উপর শুধু শুধু রাগ ক'রতে যাবেন ?"

"তবে কি ছেলেরা কিছু অন্যায় করেছে ?"

"না, তারা কিছু করেনি।"

"তবে কি চাকর-দাসীরা কেউ অবাধ্যতা দেখিয়েছে ?"

ইল্লীস্ বিরক্ত হ'য়ে ব'ললে—"না গো না—তারা অবাধ্য হবে কেন ?"

"তাহ'লে তোমার আজ বুঝি কিছু পয়সা খরচ হ'য়ে গেছে ?"

ইল্লীস্ একটু মৃদু হেসে ব'ললে—"হয়নি এখনো ; কিন্তু, বোধহয় হবে"—

ইল্লীসের স্ত্রীও এবার হেসে ফেলে ব'ললে—"ও ! বুঝিচি। তোমার বোধহয় আজ কিছু ভালো জিনিস খাবার ইচ্ছে হ'য়েছে !—না ?"

ইল্লীস্ চুপ ক'রে রইলো। তার স্ত্রী বুঝতে পারলে নিশ্চয় স্বামীর কিছু খাবার ইচ্ছা হয়েছে, কিন্তু পয়সা খরচ হয় পাছে—এই ভয়ে ব'লছেনা ; অথচ ইচ্ছাটাও

রয়েছে খুব। সে এবার মিনতি ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলে —"লক্ষ্মীটি! তোমার কি খেতে ইচ্ছে হ'য়েছে, আমাকে বলো। তোমার একপয়সাও খরচ হবে না, আমি তোমাকে অমনি তৈরী ক'রে দেবো।—"

ইল্লীস্ এবার চুপি চুপি তার স্ত্রীকে ব'ললে যে তার আজ একটু মদ খাবার সাধ হ'য়েছে বড্ড।

ইল্লীসের স্ত্রী ব'ললে—"সে জন্যে আর তুমি এতো কাতর হ'য়ে পড়েছো কেনো?—উঠে বোসো। তুমি যতটা সুরা পান ক'রতে পারো, আমি এখনি তৈরী ক'রে দিচ্ছি।—তোমার কিছু খরচ হবে না।"

ইল্লীস্ চম্‌কে উঠে ব'ললে—"খবরদার অমন কাজ কোরো না। বাড়ীতে মদ তৈরী ক'রলে এখনি পাড়া-শুদ্ধ লোক সব জানতে পারবে, আর সবাই অমনি একে একে এসে জুটবে!"

"তবে দোকান থেকে আনিয়ে দিই?"

"পাগল হ'য়েছো? বাড়ীতে ব'সে খেতে আছে? অনেক বেটা এসে ভাগ বসাবে। তুমি বরং একভাঁড় আমাকে আনিয়ে দাও, আমি লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে নদীর ধারে একটা ঝোপের আড়ালে ব'সে খাবো।"

ইল্লীসের স্ত্রী স্বামীর কথা মতই ব্যবস্থা ক'রে

দিলে। ইল্লীস্ মদের ভাঁড়টি লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে নদীর ধারে ঝোপের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে বসে বেশ মনের আনন্দে সুরা পান ক'রতে সুরু ক'রে দিলে।

এদিকে ইল্লীসের পুণ্যাত্মা পিতা স্বর্গে গিয়েও স্থির হ'তে পারছিলেন না। পুত্রের কাণ্ড কারখানা দেখে তিনি অত্যন্ত অশান্তি ভোগ করছিলেন। সাতপুরুষের অনুষ্ঠিত দান-ধ্যান, অতিথিসেবা প্রভৃতি পুণ্যব্রত সমস্ত ইল্লীস্ বন্ধ ক'রে দিয়েছে দেখে তাঁর দুঃখের আর অবধি ছিল না! ছেলে এমন কৃপণ হয়েছে যে নিজের ভোগ সুখের জন্যেও এক পয়সা ব্যয় করে না। যক্ষের ধনের মতো না-খেয়ে, না-'পরে পরিবারের সকলকে কষ্ট দিয়ে ঐশ্বর্য্য আগ্‌লে বসে আছে? তিনি পুত্রকে সুমতি দেবার জন্য ঠিক অবিকল ইল্লীসের রূপ ধ'রে স্বর্গ থেকে মর্ত্ত্যে নেমে এলেন এবং রাজার কাছে গিয়ে বললেন—"মহারাজ! আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি আপনি রাজভাণ্ডারের জন্যে গ্রহণ করুন।"

রাজা শুনে আশ্চর্য্য হয়ে ব'ললেন—"সে কি ইল্লীস্। রাজভাণ্ডারে তো ধন-রত্নের অভাব হয়নি এখনো। তোমার ঐশ্বর্য্য নিতে যাবো কেন?"

তখন ইল্লীসের রূপধারী ইল্লীসের পিতা ব'ললে—

"তবে আমাকে অনুমতি দিন মহারাজ, আমি আজ থেকে আমার পূর্ব্বপুরুষদের মতো আবার দানব্রত আরম্ভ করি।"

রাজা তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন এবং ইল্লীসের যে সুমতি হয়েছে এ দেখে তাঁর আনন্দ জ্ঞাপন করলেন।

ইল্লীসের পিতা তখন পুত্রের গৃহে গিয়ে দ্বারপালদের ডেকে বলে দিলেন যে "ঠিক তাঁরই মতো চেহারা, একেবারে অবিকল একরকম দেখতে কোনো লোক যদি বাড়ীতে ঢুকতে আসে তাকে যেন কিছুতেই তারা কেউ না-ঢুকতে দেয়। সে লোক জোচ্চোর! তাকে যেন মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

তারপর তিনি অন্তঃপুরে গিয়ে পুত্রবধুকে ডেকে পাঠিয়ে ব'ললেন—"ওগো, আমরা আজ থেকে দানব্রত গ্রহণ করি এসো। লোকজনদের ডেকে ব'লে দাও, চারিদিকে ঢেঁট্‌রা পিটে জানিয়ে দিক্ যে—সোনা, রূপো, মণিমুক্তো, যে যা' চায়—মহাশ্রেষ্ঠী ইল্লীসের বাড়ী এলেই তারা সবাই সব পাবে। কাউকে শুধু হাতে ফিরতে হবে না।

ইল্লীসের স্ত্রী স্বামীর রূপধারী শ্বশুরকে চিনতে পারলেনা, তাই তাঁর কৃপণ স্বামীর আজ এমন দান-

শীল হবার সঙ্কল্প শুনে সে প্রথমটা আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলো। তারপরই বুঝলে যে নিশ্চয় আজ সুরাপান ক'রে স্বামীর এমন উদার মতি গতি হ'য়েছে। সে তৎক্ষণাৎ লোকজন ডেকে দানসাগরের ঘোষণা ক'রে দিলে। বহুকাল পরে দরিদ্র গৃহস্থ সবারই আজ ডাক পড়লো মহাশ্রেষ্ঠীদের দানশালায়।

কেউ ঝুড়ি, কেউ চুপ্‌ড়ি, কেউ ধামা, কেউ বস্তা, কেউ থলে, কেউ জালা নিয়ে ছুটে এলো এবং যে যার মনের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে ধনরত্ন সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যেতে লাগ্‌লো। একজন খুব চালাক্ লোক রথশালা থেকে ইল্লীসের একখানি প্রকাণ্ড রথ টেনে বার ক'রে এনে সেখানিকে ধনরত্নে বোঝাই ক'রে ইল্লীসেরই দু'টি খুব ভালো গরু তাতে যুতে নিয়ে হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেলো।

নদীর ধার দিয়েই সে যাচ্ছিল—আরও অনেকেই দানসামগ্রী কাঁধে নিয়ে নদীকূলের পথ ধ'রেই ঘরে ফিরছিল। সারাটা পথ তারা ইল্লীস্ শ্রেষ্ঠীর জয়ধ্বনি ক'রতে ক'রতে এবং তার এই অমিত দানের প্রশংসা ক'রতে ক'রতে যাচ্ছিল।

নদীর ধারে ঝোপের ভিতর থেকে ইল্লীস্ সে সব কথা শুনে ভাবছিল—সে কি নেশার খেয়ালে এই রকম

সব শুনছে?—আমারই রথে—আমারই ধনরত্ন বোঝাই দিয়ে—আমারই গরু যুতে নিয়ে যাচ্ছে—ব'ললে যে একটা লোক?—এ যদি তার নেশার খেয়াল না হ'য়ে সত্যিই হয়? রাজা কি তার ধনসম্পত্তি সব সাধারণকে বিলিয়ে দিলেন?—ভয়ে, দুশ্চিন্তায় ইল্লীসের মুখ শুকিয়ে গেলো, সে আর ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারলে না, টল্‌তে টল্‌তে বেরিয়ে এলো। বেরিয়ে এসে দেখে—'সত্যই ত'!—সামনেই তার রথ! তারই ধনরত্নে বোঝাই! তারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গরু দু'টি যোতা!

ইল্লীসের আর ধৈর্য্য রইলো না।—"তবে রে! চোর! ডাকাত! বদমায়েস্। আমার যথাসর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে পালাচ্ছো?"—ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে সে এগিয়ে এসে গরুর নাকের দড়ী চেপে ধ'রলে। রথওয়ালা নেবে এসে তাকে দুই চাবুক হাঁকৃড়ে ব'ল্‌লে—"তুই চোর! তোকে আজ কোতোয়ালে নিয়ে যাবো! বেটা বদমায়েস্! মহাশ্রেষ্ঠী ইল্লীস্ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এ সব আমাদের দান করেছেন, তাঁর বাড়ীতে আজ দানসাগর ব্রত—আর তুই বলিস্ কিনা আমরা লুট ক'রে নিয়ে যাচ্ছি—"

চারিদিক থেকে সবাই ইল্লীস্‌কে—"মার্ মার্" ক'রে চেঁচিয়ে উঠলো। দু'চার জনে এগিয়ে এসে তার

চুলের খুঁটি ধ'রে বেশ ক'রে দু'চার ঘা দিয়েও গেলো। রথওয়ালা তাকে গলাধাক্কা দিতে দিতে রাস্তার ওপারে ঠেলে দিয়ে রথ নিয়ে চ'লে গেলো।

মারের চোটে ইল্লীসের নেশা ছুটে গেলো! সে তখন বাড়ীর দিকে ছুট্‌লো। যতদূর যায় দেখে সারি সারি সব লোক তারই ধন-দৌলতের বোঝা পিঠে কাঁধে মাথায় ব'য়ে ব'য়ে নিয়ে চলেছে! ইল্লীস্ কেঁদে উঠ্‌লো! চীৎকার ক'রে সকলের কাছে ছুটে ছুটে যেতে লাগলো! এর পুঁট্‌লী ধ'রে টান্‌তে লাগলো, ওর পুঁট্‌লী ধরে টানতে লাগলো! আর বলতে লাগ্‌লো—"তোরা কার হুকুমে আমার সম্পত্তি লুটে নিয়ে যাচ্ছিস্? রাজা কি হুকুম দিয়েছেন? ওরে! আমার যথাসর্ব্বস্ব শেষ হ'য়ে গেলো যে!"

লোকেরা তাকে পাগল মনে ক'রে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে যেতে লাগলো। সর্ব্বাঙ্গে ধুলো মেখে, ক্ষত-বিক্ষত দেহে, ছিন্ন-বস্ত্রে ইল্লীস্ যখন বাড়ী ঢুকতে গেলো, দ্বারবানরা তাকে ঢুকতে দিলে না। "খবরদার্" ব'লে দোর আগলে দাঁড়ালো। ইল্লীস্ তাদের মনিব হিসেবে যেই দ্বারবানদের উপর চোখ রাঙিয়ে রুখে উঠলো—তারা অমনি হাতের লাঠি উঁচিয়ে দমাদ্দম্

ইল্লীস্‌কে পিটে গলাধাক্কা দিয়ে ফটকের কাছ থেকে তাকে দূর ক'রে দিলে।

ইল্লীস্ তখন নিরুপায় হ'য়ে রাজার কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লো। করুণ আর্ত্তনাদ ক'রে ব'লে উঠলো—

"দোহাই মহারাজ! এই কি আপনার উচিত হচ্ছে! আমার অনুপস্থিতিতে আমার যথাসর্ব্বস্ব নগরবাসীদের লুট করে নিয়ে যেতে হুকুম দিয়েছেন?"

রাজা আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'ল্‌লেন—"সে কি ইল্লীস্? তুমি নিজেই তো কিছুক্ষণ আগে এসে তোমার যথাসর্ব্বস্ব ইচ্ছা-মতো দান করবার অনুমতি নিয়ে গেলে আমার কাছে?—তারপর শুনলুম তুমি ঢাক্ পিটিয়ে—ঢ্যাঁড়া দিয়ে রাজ্যের লোক ডেকে নিয়ে গেছো—দানসাগর ক'রবে ব'লে?"

ইল্লীস্ অবাক্ হ'য়ে ব'ললে—"সেকি মহারাজ! আমি আবার কখন এলুম আপনার কাছে? এ কি সম্ভব? আপনি তো জানেন আমি কী রকম কৃপণ লোক। আমি কখনো এক কপর্দ্দকও কাউকে দান করিনি, করবোও না। এ নিশ্চয় আমার কোনো শত্রুর কাজ! মহারাজ! যে আমার যথাসর্ব্বস্ব দান ক'রে আমাকে এমন ক'রে পথের ভিখারী ক'রে দিচ্ছে। তাকে এখনি ডেকে আনিয়ে এর বিচার করুন।"

রাজা তখন অনুচর পাঠিয়ে ইল্লীসের বেশধারী ইল্লীসের পিতাকে রাজ সভায় ডেকে আনালেন। তাদের দু'জনের একরকম চেহারা দেখে সভাশুদ্ধ সকলে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলো। কে যে প্রকৃত ইল্লীস্ কেউ ধ'রতে পারলে না। ইল্লীস্ কেবলই ব'লতে লাগ্‌লো—"মহারাজ! আমিই মহাশ্রেষ্ঠী ইল্লীস্।"

রাজা ব'ললেন—"প্রমাণ কি? আমি তো দু'জনের মধ্যে কোনো প্রভেদ বুঝতে পারছিনি! তুমিই যে যথার্থ ইল্লীস্ আমি তা' কেমন ক'রে জানবো?—আর কেউ তোমায় চিনতে পারে কি? ঠিক নিশ্চয় ক'রে কেউ ব'লতে পারে কি যে—তুমিই প্রকৃত ইল্লীস্?—"

ইল্লীস্ হাত জোড় ক'রে ব'ললে—"মহারাজ! আমার স্ত্রীকে আনবার হুকুম দিন। সে নিশ্চয় আমাকে চিনতে পারবে।

রাজার হুকুমে ইল্লীসের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-দাস-দাসী সবাই এলো, কিন্তু একে একে তারা সকলেই ছদ্মবেশী ইল্লীসের পিতাকেই প্রকৃত ইল্লীস্ ব'লে ঘোষণা ক'রলে!

তখন নিরুপায় হ'য়ে ইল্লীস্ ব'ললে—"আচ্ছা, আমার নাপিতকে ডাকতে হুকুম দিন মহারাজ! সে আমাকে নিশ্চয় চিনতে পারবে।"

রাজার হুকুমে নাপিতও এলো। ইল্লীস্ তার কাছে

মাথাটা বাড়িয়ে দিয়ে ব'ললে—"দেখোতো, আমিই তোমার মনিব মহাশ্রেষ্ঠী কিনা ?—

নাপিত ইল্লীসের মাথায় হাত বুলিয়ে দেখে ব'ললে—"হ্যাঁ মহারাজ ! ইনিই মহাশ্রেষ্ঠী বটে !"

রাজা জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"কী ক'রে বুঝলে ?"

নাপিত ব'ললে—"এঁর মাথার চুলের মধ্যে একটি আঁচিল আছে, তাই থেকেই ধরলুম !

ইল্লীস্ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠে ব'ললে—"দেখলেন ? শুনলেন তো মহারাজ ! আমি মিথ্যা বলিনি।—আমি যথার্থ সেই ইল্লীস্ ! "তারপর নাপিতকে ডেকে ব'ললে—"নাপিত, আমি তোকে প্রচুর পুরস্কার দেবো।"

রাজা গম্ভীরভাবে ব'ললেন—"নাপিত, তুমি এঁর মাথাও পরীক্ষা ক'রে দেখো দেখি আঁচিল আছে কিনা ?"

ইল্লীস্ খুব দৃঢ় স্বরে ব'লে উঠলো—"ও আঁচিল কোথা পাবে মহারাজ ? এ আমার আজন্মকাল রয়েছে ! ওতো একটা জোচ্চোর !"

রাজার হুকুমে নাপিত ইল্লীস্‌রূপধারী ইল্লীসের পিতার মস্তক পরীক্ষা ক'রে ব'ললে—"মহারাজ ! বড়ই বিপদ ! এঁরও মাথায় ঠিক সেই জায়গায়

১২। কৃপণের ধন
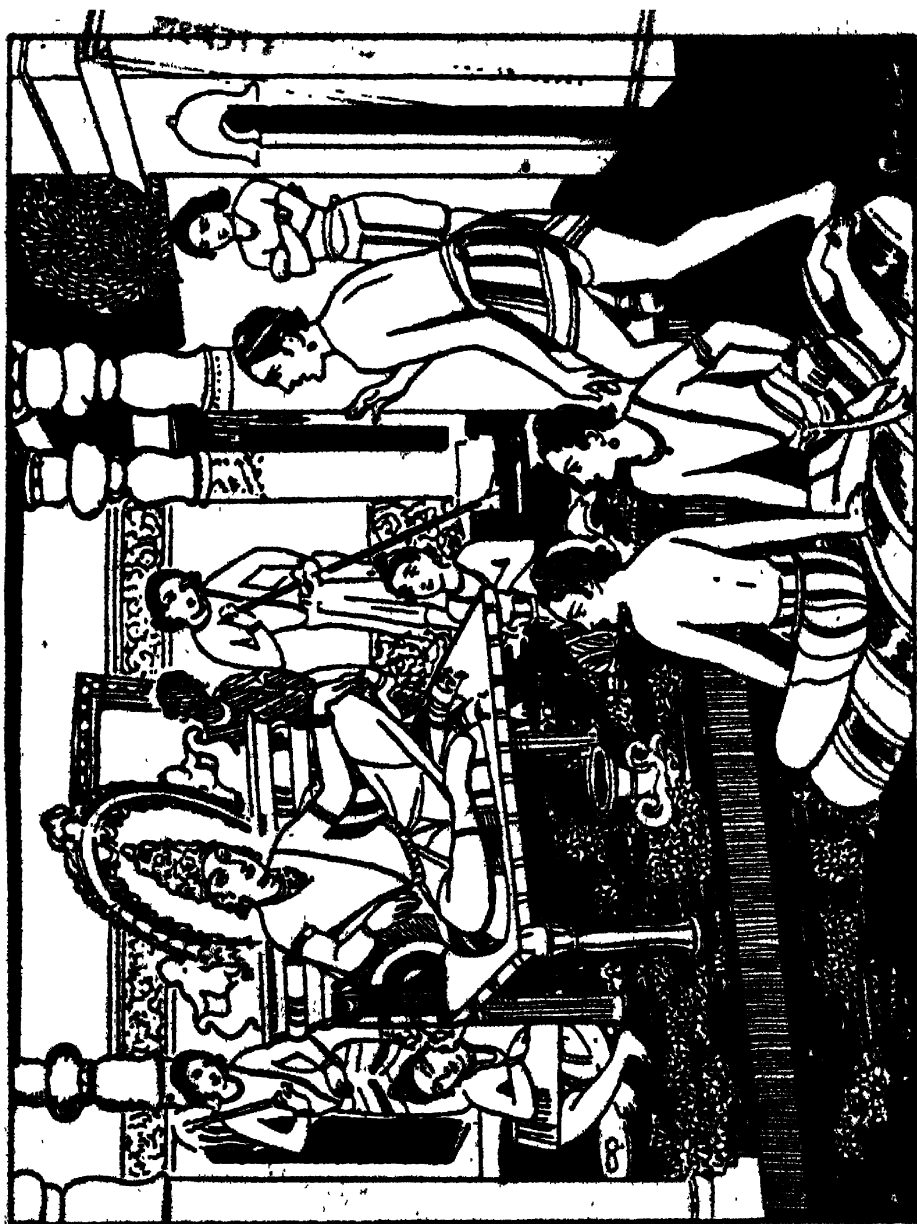
—ঠিক সেইরকম আঁচিল রয়েছে।—অতএব আমি ঠিক বুঝতে পারছিনি যে এঁদের মধ্যে প্রকৃত মহাশ্রেষ্ঠী কে?"

ইল্লীস্ শুনে কাতরভাবে ব'লে উঠ্‌লো—"এঁ্যা! বলিস্ কি নাপিত? ওরে বাবা! ওরও মাথায় আঁচিল? তবেই তো সেরেছে।"—ব'লতে ব'লতে টাকার শোকে সে রাজসভায় মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লো।

ইল্লীসের পিতা সেই সময় ছদ্মরূপ পরিত্যাগ ক'রে রাজাকে সব বুঝিয়ে ব'ললেন যে, কী উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি স্বর্গ থেকে এসেছেন। রাজা শুনে খুব খুশী হ'লেন। ইতিমধ্যে—ইল্লীসের জ্ঞান হ'লো। তখন ইল্লীসের পিতা ইল্লীস্‌কে তার সমস্ত অন্যায় বুঝিয়ে দিয়ে ব'ললেন যে, সে যদি তার পিতা পিতামহদের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মকর্ম্ম দান ও আতিথেয়তা পালন না-করে, তাহ'লে ধন-সম্পত্তি এক কপর্দ্দকও তার থাকবে না, এবং অবিলম্বে বজ্রাঘাতে তার অকালমৃত্যু হবে।

ইল্লীস্ প্রাণভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে করজোড়ে প্রতিজ্ঞা ক'রলে যে এবার থেকে সে তার পিতা ও পিতামহদের মতই দানশীল হবে।

ইল্লীসের পিতা তার কথা শুনে সন্তুষ্ট হ'য়ে স্বর্গে ফিরে গেলেন।

তারপর থেকে ইল্লীস্ যথার্থই একজন দানবীর হ'য়ে উঠলো, এবং দীর্ঘকাল বেঁচে থেকে নানা পুণ্য-কার্য্য ক'রে অবশেষে মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ ক'রলে।

রত্ন বৃষ্টি

(গৌতমের গুরুভক্ত শিষ্য-জন্ম)

একজন আচার্য্য ব্রাহ্মণ তাঁর শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা ক'রবেন ব'লে বাড়ী থেকে বেরুলেন।

পথের মাঝে একটা গভীর বন পার হ'য়ে যেতে হয়। সেই বনে ছিল পাঁচশো' ডাকাত। তারা পথিকদের ধ'রে টাকাকড়ি সব কেড়ে নিতো! যাদের কাছে কিছু পেতোনা তাদের আট্‌কে রাখতো। দু'জন থাকলে একজনকে রেখে, একজনকে পাঠিয়ে দিতো তার সঙ্গীকে খালাস করবার জন্য টাকার যোগাড় ক'রে আনতে!

এই ডাকাতগুলো যেমনি নিষ্ঠুর, তেমনি শয়তান! যদি বাপ আর ছেলেকে একসঙ্গে ধ'রতে পারে,

তাহ'লে বাপকে পাঠিয়ে দেয় নিৰ্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে টাকা সংগ্রহ ক'রে এনে ছেলেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে যাবার জন্য। মা আর মেয়েকে ধ'রলে ওরা মা'কেই পাঠিয়ে দেয় অর্থ সংগ্রহ ক'রে এনে মেয়েকে উদ্ধার করবার জন্য। গুরু আর শিষ্যকে ধ'রলে—শিষ্যকেই পাঠিয়ে দেয় ওরা গুরুদেবকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা করতে।

টাকা নিয়ে ফিরতে নিৰ্দ্দিষ্ট দিনের চেয়ে একটি দিনও যদি দেরী হয় তাহ'লে আর রক্ষে নেই! যাকে ধ'রে রাখে, তাকে সেইদিন একেবারে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কেটে ফেলে!

ব্রাহ্মণ শিষ্যকে নিয়ে খুব ভয়ে ভয়েই সেই বনের পথটুকু পার হ'চ্ছিলেন। কিন্তু মাঝপথ বরাবর যেতে না-যেতেই ডাকাতেরা তাদের ধ'রে ফেললে!

ব্রাহ্মণ আর তার শিষ্যের কাছে টাকাকড়ি বিশেষ কিছুই নেই দেখে,—ব্রাহ্মণকে বন্দী ক'রে তাঁর শিষ্যকে ওরা ছেড়ে দিলে—টাকা নিয়ে আসবার জন্যে। শিষ্য যাবার আগে গুরুদেবকে প্রণাম ক'রে ব'ললে—"আচার্য্য, আমি তিনদিনের মধ্যে নিশ্চয় টাকা যোগাড় ক'রে নিয়ে ফিরে আসবো! আপনি ভয় পাবেন না,

কিম্বা, অধীর হ'য়ে আমি ফিরে আসবার আগেই মন্ত্রবলে যেন স্বর্গ হ'তে কিছু রত্ন বর্ষণ করাবেন না, তাহ'লে আর আপনার প্রাণ রক্ষা হবে না! এটুকু মনে রাখবেন।”

আচার্য্যকে এই ব'লে সাবধানে থাকতে অনুরোধ জানিয়ে শিষ্য অর্থ সংগ্রহ ক'রে আনতে চ'লে গেলো। ডাকাতেরা ব্রাহ্মণকে একপাশে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে দিলে!

অতি কষ্টে ব্রাহ্মণের একদিন কাটলো। তার পরদিনও সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত তিনি কোনো রকমে ধৈর্য্য ধ'রে পড়েছিলেন; কিন্তু, সন্ধ্যার অন্ধকার দূর ক'রে দিয়ে বনের আকাশে যখন পূর্ণচন্দ্র দেখা দিলে, ব্রাহ্মণ আকাশের গ্রহনক্ষত্রের দিকে চেয়ে দেখেই বুঝতে পারলেন যে আজ বৎসরান্তে শুভ রত্নবর্ষণ-যোগ উপস্থিত হ'য়েছে! ব্রাহ্মণ ছিলেন মন্ত্রসিদ্ধ! এই যোগের শুভক্ষণে যে মন্ত্র উচ্চারণ করলে আকাশ থেকে তৎক্ষণাৎ নানা রত্ন বর্ষণ হবে, ব্রাহ্মণ সেটি জানতেন। তিনি ভাবলেন টাকার জন্যই যখন এরা আমাকে বেঁধে রেখেছে, তখন মন্ত্রপড়ে রত্নবর্ষণ করিয়ে যদি এদের দিই, তাহ'লেই তো আমাকে এরা ছেড়ে দেবে! শিষ্য

আমার বালক। তার বুদ্ধি বিবেচনা কম; তাই সে এরূপ ক'রতে আমাকে নিষেধ ক'রে গেছে। আমি মুক্ত হ'য়েছি দেখলে সে খুশীই হবে।

এই মনে করে ব্রাহ্মণ দস্যুদের ডেকে ব'ললেন, "—ওহে তোমরা তো টাকা চাও?" দস্যুরা ব'ললে—"আজ্ঞে সেই অভিপ্রায়েই তো প্রভুকে বেঁধে রেখেছি।" ব্রাহ্মণ ব'ললেন—"আচ্ছা বেশ, তোমরা তবে এক কাজ করো, আমার বাঁধন খুলে দিয়ে আমাকে স্নান করিয়ে, নুতন কাপড় পরিয়ে, চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য মাখিয়ে এবং ফুলের মালা পরিয়ে একলাটি একটু নির্জ্জনে থাকতে দাও, আমি তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'রবো!"

দস্যুরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রতে লাগলো! তাদের আশঙ্কা ও সন্দেহ হচ্ছিল যে ব্রাহ্মণ হয়ত' তাদের চোখে ধূলো দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে! —কিন্তু, এ বন তাদেরই রাজ্য! ব্রাহ্মণ এখান থেকে পালাবার পথ খুঁজে পাবে না। এই ভরসায় নিশ্চিন্ত হ'য়ে তারা ব্রাহ্মণকে স্নান করিয়ে, গন্ধ লেপন করিয়ে, নববস্ত্র পরিয়ে, পুষ্পমাল্যে সাজিয়ে, নির্জ্জনে বসিয়ে দিলে।

ব্রাহ্মণ আসনে বসে লগ্ন উপস্থিত জেনে তাঁর সিদ্ধ-

মন্ত্র উচ্চারণ ক'রতে স্থরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে নানা মহামূল্য রত্নরাজি বর্ষণ হ'তে লাগলো। দস্যুরা মহা আনন্দে সেই সব রত্ন সংগ্রহ ক'রে দেশে ফিরে চললো। ব্রাহ্মণও নিশ্চিন্ত হ'য়ে তাদের অনুসরণ ক'রলেন। কারণ, সেখান থেকে বেরিয়ে যাবার পথ তিনি জানতেন না।

কিন্তু, অল্পদূর যেতে-না-যেতেই আর একদল ডাকাত এসে তাদের সকলকে ঘিরে ফেল্‌লে! তখন আগের দস্যুরা নূতন ডাকাতের দলকে ব'লে দিলে যে যদি তোমরা প্রচুর ধনরত্ন পেতে চাও তাহ'লে এই ব্রাহ্মণকে ধরো। ইনি মন্ত্র পড়ে আকাশের দিকে চাইলেই রত্নবৃষ্টি হয়। আমরা এই যে সব ধনরত্ন নিয়ে যাচ্ছি, এ সমস্ত ইনিই আমাদের দিয়েছেন!

এ কথা শুনে নূতন ডাকাতের দল আগের দস্যুদের ছেড়ে দিলে এবং সবাই মিলে ব্রাহ্মণকেই চেপে ধ'রে ব'ললে—"তুমি ওদের যেমন ধনরত্ন দিয়েছো, তেমনি আমাদেরও দাও!" ব্রাহ্মণ তাঁদের বুঝিয়ে ব'ল্‌লেন যে—"বাপুহে, যে শুভযোগে স্বর্গ থেকে 'রত্নবর্ষণ' হয়, সে শুভযোগ এইমাত্র উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে! এখন আর কোনো উপায় নেই। আবার এক বৎসর পরে

এই শুভযোগ ফিরে আসবে, তোমরা যদি ততদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করো তাহ'লে আমি আগামী বৎসর তোমাদের জন্যেও 'রত্নবর্ষণ' করাতে পারবো!"

ব্রাহ্মণের কথা শুনে ডাকাতের দল ভয়ানক রেগে উঠলো। আচার্য্যের কথা তারা বিশ্বাস ক'রলে না। ব্রাহ্মণ তাদের সঙ্গে প্রতারণা ক'রছে মনে করে তারা ব্রাহ্মণকে তৎক্ষণাৎ মেরে ফেললে, এবং আগের দস্যুদের ধরবার জন্য তাদের পিছু পিছু ছুটলো।

খানিকদূর গিয়েই এরা তাদের ধ'রে ফেললে। তখন দু'দলে তুমুল যুদ্ধ বেধে গেলো। প্রথমদল তাদের ধনরত্ন সামলে রাখতে গিয়ে দ্বিতীয় দলের কাছে যুদ্ধে হেরে গেলো। প্রথম দলের পাঁচশো দস্যুকেই দ্বিতীয় দলের পাঁচশো ডাকাত মেরে ফেল্লে এবং তাদের ধনরত্ন সমস্তই নিয়ে নিলে।

তারপর সেই লুটের ভাগ নিয়ে আবার তাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেলো। তারা দু'দলে বিভক্ত হ'য়ে পরস্পরের সঙ্গে মারামারি কাটাকাটি সুরু করে দিলে। শেষে দেখা গেলো তাদের মধ্যে মাত্র আর দু'জন বাকী আছে। আর সবাই অর্থের লোভে প্রাণ দিয়েছে। তখন তারা দু'জনে আর

পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ না ক'রে উভয়ে মিলে সেই সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে গভীর জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে রাখলে।

তখন সকাল হ'য়ে গেছলো। সারারাত্রি যুদ্ধ ক'রে তারা দু'জনেই ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে পড়েছিল। জঙ্গলের বাইরের কোনো গ্রাম থেকে কিছু খাদ্য সংগ্রহ ক'রে আনতে না-পারলে তাদের আর প্রাণ বাঁচে না। অথচ এত কষ্টে পাওয়া ধনরত্ন ছেড়ে তারা কোথাও যেতেও সাহস ক'রছিল না। অনেকক্ষণ পরে দু'জনে পরামর্শ করে স্থির ক'রলে যে একজন তরওয়াল খুলে এখানে পাহারা দেবে, আর একজন গিয়ে গ্রাম থেকে তৈরী ভাত ডাল সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আসবে।

পরামর্শ মতো একজন ভাত আনতে চলে গেলো। আর একজন তরওয়াল খুলে সেখানে পাহারা দিতে লাগলো। ভাত নিয়ে আসতে সঙ্গীর দেরী হ'চ্ছে দেখে যে পাহারা দিচ্ছিল, সে ভাবলে—ও যদি আর না-আসে তাহ'লে এ সমস্ত ধনরত্ন আমারই একলার ভোগে আসবে। ওকে আর ভাগ দিতে হবে না। এই কথা ভাবতে ভাবতে তার লোভ এতো বেড়ে গেলো, যে, সে স্থির ক'রে ফেললে—গাঁ থেকে ভাত নিয়ে সঙ্গীটা যেমনি আসবে অমনি তাকে এই তরওয়াল দিয়ে

কেটে ফেলবো, তাহ'লেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে এ সমস্ত ধন-রত্ন আমি একা নিয়ে যেতে পারবো। মনে মনে এই স্থির ক'রে সে তরওয়ালখানা বাগিয়ে ধ'রে অধীর হ'য়ে সঙ্গীর ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা ক'রতে লাগলো।

এদিকে গ্রাম থেকে যে ভাত আনতে গেছলো সে পথে যেতে যেতে ভাবলে, যে, আর একজনকেই বা মিছিমিছি সে ধনরত্নের ভাগ দিতে যাবে কেন? সে ওর ভাতে বিষ মিশিয়ে নিয়ে যাবে। সেই ভাত খেয়ে তার সঙ্গী মরে যাবে। তখন ও সমস্ত ধনরত্ন তারই একার ভোগে আসবে। এই ভেবে সে নিজে বেশ পেট ভ'রে ভাত খেয়ে নিয়ে, সঙ্গীর জন্য বিষ-মিশানো ভাত নিয়ে চললো।

বনের মধ্যে ঢুকে তার সঙ্গীর কাছে গিয়ে সে যেমন ভাতের থালাটি হেঁট হ'য়ে নামিয়ে রাখতে গেছে, অমনি তার সঙ্গীটী হাতের তরোয়াল দিয়ে এক কোপে তাকে দু'খানা ক'রে কেটে ফেললে! তারপর, সমস্ত ধনরত্ন গুছিয়ে নিয়ে যাবার আগে তৈরী-ভাতের লোভ আর ক্ষিদের মুখে সামলাতে না পেরে সব ভাতক'টি পেট ভ'রে খেয়ে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গেই বিষের ক্রিয়া সুরু হ'লো এবং সেইখানেই সে ঢলে' পড়ে' মরে' গেলো।

সেদিনই সেই ব্রাহ্মণের শিষ্যটির টাকা নিয়ে বনে ফিরে আসবার কথা ! কারণ ডাকাতদের দেওয়া তিন দিনের সময় পূর্ণ হয়ে যাবে সেদিন। ব্রাহ্মণের শিষ্য দস্যুদের নির্দ্দিষ্ট অর্থ বহুকষ্টে সংগ্রহ ক'রে গুরুদেবকে উদ্ধার করবার জন্য সেই বনে ফিরে এসে দেখে—কেউ নেই সেখানে ! কিন্তু, স্থানে স্থানে মহামূল্য ধনরত্ন কিছু কিছু পড়ে রয়েছে। দেখেই বুদ্ধিমান শিষ্য বুঝতে পারলে যে, নিশ্চয় গুরুদেব অধীর হ'য়ে কালকের শুভযোগে আকাশ থেকে রত্ন বৃষ্টি করিয়ে ছিলেন এবং তারই ফলে নিশ্চয় তাঁর কোনো বিপদ ঘটেছে।

তখন বনপথে দস্যুদের পায়ের দাগ দেখে দেখে সে এগিয়ে যেতে লাগলো। খানিক দূর গিয়ে দেখে সেখানে তাঁর আচার্য্যের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে ! শিষ্যের প্রাণে বড় কষ্ট হ'লো ! গুরুদেবের এমন অপঘাত মৃত্যু হ'য়েছে দেখে সে কেঁদে ফেললে ! তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে বন থেকে শুক্‌নো কাঠ সংগ্রহ ক'রে চিতা তৈরি ক'রলে এবং গুরুদেবের মৃতদেহ যথাবিধি সৎকার ক'রে সে দস্যুদের সন্ধানে চ'ললো। অল্পদূর যেতে না-যেতে সে অসংখ্য দস্যুদের মৃত দেহ একজায়গায় পড়ে রয়েছে দেখতে

পেলে। বুঝতে পারলে যে এরা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করে মরেছে। কিন্তু, কিছুদূর পর্য্যন্ত আরও দু'জন লোকের পদচিহ্ন রয়েছে দেখে ব্রাহ্মণের শিষ্যটি সেইদিকে অগ্রসর হ'লো এবং জঙ্গলের মধ্যে যেখানে ধনরত্ন লুকানো ছিল, সেইখানে এসে পৌঁছালো।

দলের অবশিষ্ট দু'জন দস্যুর মৃতদেহ সেখানে দেখে বুদ্ধিমান শিষ্যের কিছু বুঝতে আর বাকী রইল না। ধনরত্নের লোভে যে মানুষের কত অনিষ্ট হ'তে পারে এই ঘটনায় তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে ব্রাহ্মণের শিষ্য সেই ধনরত্ন সমস্ত নিয়ে গিয়ে দীন-দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে এবং অন্যান্য পুণ্য কার্য্যে ব্যয় করলেন।